দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

মরণকালে হরিনামের মতো বামেদের গান্ধী-নাম স্মরণ

—পৃঃ ১২

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি বহুদিন ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী দল হিসাবে থাকবে

— পৃঃ ২৭

৬৯ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।। ৬ মার্চ ২০১৭।। ২২ ফাল্গুন - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

নগদহীন লেনদেন

রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির পেট্রল/ডিজেলের দাম কার্ডে মেটালে ০.৭৫% ছাড়।

আর এফ আই ডি/ফাসট্যাগ কার্ডের মাধ্যমে জাতীয় সড়কের টোল ট্যাক্স দিলে ১০% ছাড়।

ট্রেনের সিজন টিকিটের দাম ডিজিটালে মেটালে ০.৫% ছাড় পাবেন।

২০০০ টাকা পর্যন্ত ডিজিটাল লেনদেন বা এমডিআর-এর ক্ষেত্রে কোনো পরিষেবা কর নয়।

গ্রাহক পোর্টালের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থার প্রিমিয়ামে ১০% ছাড়।

৪ কোটি ৩২ লক্ষ কৃষককে ‘রুপে কিষান কার্ড’ দেওয়া হবে নাবার্ডের সহায়তায়।

দশ হাজারের কম জনসংখ্যার ১ লক্ষ গ্রামে ২টি করে পি এস ও মেশিন দেবে সরকার।

কেন্দ্র সরকার ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি ট্রানজাকশন ফি এবং এম ডি আর-এর খরচ বহন করবে ।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ২২ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৬ মার্চ - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

বিপুল সংখ্যায় সাংবাদিক ছাঁটাইয়ে নীরব কলকাতার সাংবাদিকরা ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : ও দিদি, তুমি কি অন্ধ গো?
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

মরণকালে হরিনামের মতো বামেদের গান্ধীনাম স্মরণ
▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১২

নগদহীন অর্থনীতি শেষ শয্যায় দুর্নীতি
▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৪

ক্যাশলেস ইকনমি : সমস্যা বনাম সম্ভাবনা
▯ দেবাশিস আইয়ার ▯ ১৬

ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন কীভাবে করবেন
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৮

নোটবন্দি ইস্যু ▯ জয়দীপ রায় ▯ ২০

প্রাণের ঠাকুর সীতারাম ▯ সারদা সরকার ▯ ২১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত
▯ সলিল গেঁউলি ▯ ২৩

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি বহুদিন ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী দল হিসেবে থাকবে
▯ আকার প্যাটেল ▯ ২৭

গো-ভিত্তিক নৈসর্গিক কৃষি মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক
▯ অধ্যাপক নির্মল মাইতি ▯ ২৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬- ৩৮▯ খেলা : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪৯ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রকাশিত হবে
১৩ মার্চ
২০১৭

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৩ মার্চ
২০১৭

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সামাজিক সমরসতা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে দোলপূর্ণিমা তিথিতে আমরা একে অপরকে রঙ মাখিয়ে একাত্মতার আনন্দ অনুভব করি। শ্রীচৈতন্যদেবও জাতপাতদীর্ণ এই সমাজে প্রেম-প্রীতির ভাব প্রচার করে সামাজিক সমরসতা সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। আজও আমাদের সমাজে বিষয়টি একইভাবে প্রাসঙ্গিক। আগামী সংখ্যাটি এই বিষয় নিয়েই লিখেছেন— ড. সীতানাথ গোস্বামী, শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী, রসিক গৌরাঙ্গ দাস।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

প্রতিবাদের নূতন সংস্কৃতি

সম্প্রতি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রামজস কলেজে ছাত্রদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটিয়া যাইল তাহা কিছুদিন আগে জে এন ইউ-র সংঘর্ষের কথা মনে করাইয়া দেয়। ওই সংঘর্ষের সময় 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' (ভারত টুকরো টুকরো হবে) এবং সংসদ আক্রমণের চক্রী আফজল গুরুর হত্যাকারীরা (পড়ুন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা) যে এখনও জীবিত আছে তাহা লজ্জার বিষয় বলিয়া স্লোগান তোলা হয়। জেএনইউ-র এই ঘটনায় যে দুইজন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের একজন উমর খালিদ এবং অপরজন কানহাইয়া কুমার। রামজস কলেজের শিক্ষকদের উদ্যোগে 'প্রতিরোধের সংস্কৃতি' বিষয়ে যে সেমিনারের আয়োজন করা হইয়াছিল সেখানে বক্তা হিসাবে উমর খালিদকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। উমর খালিদের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহ'-এর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও আমন্ত্রণের কারণ হিসাবে বলা হইয়াছিল খালিদের পিএইচডি-র বিষয় জনজাতি কেন্দ্রিক। খালিদের গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহা যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য—এই বিষয়ে এখনও সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। সেমিনার উৎসব-অনুষ্ঠানে কোনো বিতর্কিত ব্যক্তিকে অংশগ্রহণ করাইবার এখন একটি রীতি তৈরির চেষ্টা চলিতেছে। খালিদের বিরোধিতা হওয়া তাই স্বাভাবিক এবং তাহা হইয়াছেও। উদ্যোক্তাদের পক্ষে জানানো হইয়াছিল এই বিরোধিতা অমূলক, কেননা ওই আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। যুক্তি যাহাই হউক, বাকস্বাধীনতার নামে দেশবিরোধী স্লোগান বরদাস্ত করা যায় না। খালিদের বিরোধীদের প্রতিরোধের জন্য বামপন্থী সংগঠনগুলি দেশবিরোধী স্লোগান কেন দিতেছে?

জে এন ইউ-তে যেমন কাশ্মীরের সঙ্গে মণিপুরের 'আজাদি'-র স্লোগান উঠিয়াছিল, রামজস কলেজে তেমনি কাশ্মীরের সঙ্গে বস্তারের 'আজাদি'র স্লোগান উঠিয়াছে। জনজাতিদের বিষয়ে গবেষণা করিতে গিয়া খালিদ কি জানিতে পারিয়াছেন বস্তারের মানুষ 'আজাদি' চাহিতেছেন? ইহা কোন ধরনের প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সংস্কৃতি? রামজস কলেজের যেসব শিক্ষক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খালিদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন তাহা যে বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে পারে তাহা তাহাদের অজানা ছিল না। তবুও দেশবিরোধী তত্ত্বকে মদত দিতেই তাহাদের এই অপচেষ্টা।

এখন আবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী গুরমেহর কৌরকে মদত দিতে তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কানহাইয়া কুমারের সম্পর্কে সীতারাম ইয়েচুরি, অরবিন্দ কেজরিয়ালের মতো নেতারা-সহ বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলি যেমন গর্ববোধ করিত, এখন গুরমেহরকে কেন্দ্র করিয়া তাহাই করা হইতেছে। কেননা গুরমেহর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নিন্দা করিয়া ফেসবুকের মাধ্যমে জানাইয়াছেন যে তিনি ভয় পান না এবং দেশের ছাত্রসমাজ তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। ছাত্রসমাজের অনেকে বিদ্যার্থী পরিষদের সহিত সহমত না হইতে পারে, যাহা বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলির পক্ষেও প্রযোজ্য। কিন্তু রামজস কলেজের ঘটনার জন্য দেশের সকল ছাত্র এবিভিপি-র বিরোধী—গুরমেহরের এই ইঙ্গিত ঠিক নয়। গুরুমেহরের অন্য পরিচয় যে সে কার্গিল যুদ্ধে এক শহিদ সৈনিকের কন্যা। গুরমেহর আরও বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা পাকিস্তানের সেনার গুলিতে নয়, যুদ্ধে শহিদ হইয়াছে। এক শহিদের কন্যা হিসাবে তিনি সম্মানের পাত্রী, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার যুক্তি এইরকম—লোকটি নদীতে ডুবিয়া নয়, জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। পাকিস্তান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শান্তিপ্রিয় দেশ—তাঁহার এই বক্তব্য স্বীকার করা যায় না। অনেক উজ্জ্বল দ্রব্য যেমন সোনা নহে, তেমনি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত সকল তথ্যই সত্য নহে। গুরমেহরকে যাঁহারা আর একটা কানহাইয়া কুমার তৈরিতে মদত জোগাইতেছেন, তাঁহার শুধু প্রতিবাদের পাত্র নন, ধিক্কারযোগ্যও।

সুভাষিতম্

তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং তৃণং শূরস্য জীবিতম্।
জিতাক্ষস্য তৃণং নারী নিঃস্পৃহস্য তৃণং জগৎ।। (চাণক্য শ্লোক)

ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট স্বর্গ তৃণসম, বীরের নিকট জীবন তৃণসম, জিতেন্দ্রিয় পুরুষের নিকট নারী তৃণসম এবং নিস্পৃহ ব্যক্তির নিকট সমগ্র জগৎই তৃণসম।

সিঙ্গুর জমি আন্দোলন

অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসে তৃণমূলের মাহাত্ম্য কীর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সুপ্রিম কোর্টের রায়দানের পর এখনও ভালো করে ছ'মাসও কাটেনি, অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ে ঢুকে পড়ল সিঙ্গুর জমি আন্দোলন। এখন থেকে ছাত্রছাত্রীরা সিঙ্গুর জমি আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নানান 'কৃতিত্বের' খবর ইতিহাস বইতেই পেয়ে যাবে। যদিও, সিঙ্গুর জমি আন্দোলনে একদা মমতার সহযোগী কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক বিষয়ে বিরোধী সিপিআই (এম এল) এবং এস ইউ সি আই ইতিহাসে জায়গা পায়নি।

২০১৬-র ৩১ আগস্ট, সুপ্রিম কোর্ট টাটা মোটরসের ন্যানো গাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপন করার জন্য সিঙ্গুরে বামফ্রন্ট সরকারের ১,০৫৩ একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিল। সেই সঙ্গে জমির মালিকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিল আদালত। রাজনৈতিক মহলের একাংশের অভিমত, সারদা ও রোজভ্যালি কাণ্ডে অভিযুক্ত নেত্রী ও দলের নষ্ট ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সিঙ্গুর জমি আন্দোলনকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষাদপ্তর।

অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে, 'জমি, জল, জঙ্গল : জীবন জীবিকার অধিকার ও গণ-আন্দোলন'। অধ্যায়ের প্রথম তিন-চার পাতায় তেভাগা, তেলাঙ্গানা, চিপকো অ্যাপিকো, সাইলেন্ট ভ্যালি এবং নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কথা দায়সারাভাবে বলার পর শুরু হয়েছে সিঙ্গুর জমি আন্দোলন। তৃণমূল-সুপ্রিমোর ভাবমূর্তি মহামানবিক করার বাসনায় লেখক মন্তব্য করেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই জমিতে ধানের বীজ ছড়িয়ে আন্দোলনের সূচনা করেন।'

এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে আন্দোলনের অন্যতম রূপকার কৃষিজমি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোটেই আন্দোলন শুরু করেননি। স্থানীয় কৃষকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তৃণমূল পরে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। কৃষি জমি রক্ষা কমিটি তৈরি হয়েছিল ৪ জুন আর মমতা বীজ ছড়ান ১৮ জুলাই।' অন্যদিকে এস ইউ সি আই-এর সন্তোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'সিঙ্গুর আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শুরু হয়েছিল। কোনো দল এককভাবে আন্দোলন পরিচালনা করেনি। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কৃষকেরা যে কৃষিজমি রক্ষা কমিটি গঠন করেছিল তাতে শুধু তৃণমূল নয়, অন্য অনেক দলের প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর কোনোটাই বইতে আসেনি।'

শিবরাত্রিতে ময়ূরেশ্বরে শিবমন্দিরে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার একচক্রা গ্রামে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে গ্রামের মুসলমান পাড়ায় অশ্লীল নাচ-গানের আসর বসে, স্থানীয় ভাবে যা পঞ্চরসের গান নামে পরিচিত। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলায় পরীক্ষার্থীদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে এবং পুলিশের বিনা অনুমতিক্রমে উচ্চৈঃস্বরে মাইক বাজিয়ে পাড়া মাথায় করার কারণে ময়ূরেশ্বর থানা থেকে পুলিশ এসে সেই কুরুচিপূর্ণ পঞ্চরস গানের আসর বন্ধ করে দেয়।

খবরে প্রকাশ, পুলিশের কাছ থেকে অনুষ্ঠান করতে বাধা পেয়ে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ উন্মত্ত মুসলমান জেহাদিরা শিবরাত্রির দিন রাত ১০টায় একচক্রার ডাবুক শিব মন্দিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্র অনুসারে, শিবরাত্রি উপলক্ষে একদিকে যখন গ্রামের হিন্দু মহিলারা শিবের মাথায় জল ঢালতে ব্যস্ত, অন্যদিকে গ্রামের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা মনপ্রাণ ঢেলে হরিনাম সংকীর্তন শুনছেন, সেই সময় একদল মুসলমান জেহাদি আচমকা মন্দিরে ঢুকে হামলা চালায়।

প্রায় ৩০-৪০ জনের একটি মারমুখী মুসলমানের দল হঠাৎ-ই মন্দিরে ঢুকে লাইট, সাউন্ড-সিস্টেম-সহ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন উপকরণ ভেঙে ফেলে কীর্তনীয়া মহিলা এবং শ্রোতাদের উদ্দেশে এলোপাথাড়ি ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। ফলে প্রাণভয়ে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়ে যায়। তাদের মধ্যে, কেউ কেউ বা আবার প্রাণভয়ে বাথরুমেও আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এরপর সমস্ত কিছু তছনছ করে, কীর্তন বন্ধ করে মুসলমান জেহাদিরা ফিরে যায় এবং যাবার আগে, আবার কীর্তন চালু হলে সবাইকে খুন করা হবে হুমকিও দিয়ে যায়। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে চিহ্নিত অভিযুক্তদের একটি তালিকা থানায় জমা দিলেও পুলিশ জেহাদিদের গ্রেপ্তার করতে অস্বীকার করে। এলাকায় এই নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে বলেই সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী জানা গেছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

পাকিস্তানের সঙ্গে আর সামরিক মহড়ায় নেই রাশিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনোরকম যৌথ সামরিক মহড়া নয়, এমনই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে রাশিয়া। প্রসঙ্গত, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের আবহে পাকিস্তানের সঙ্গে রাশিয়া সন্ত্রাস-বিরোধী যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করে, যা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ জানায় নয়াদিল্লি। মূলত সেই কারণেই রাশিয়া প্রত্যাহার করে নিতে চলেছে যৌথ মহড়ার যাবতীয় ভবিষ্যত কর্মসুচি। রাশিয়া সরকারের বিশ্বস্ত সূত্র উদ্ধৃত করে ইংরেজি দৈনিক দ্য পাইওনিয়ার জানিয়েছে— ভারতের বিশ্বাস অর্জনের জন্য এবং ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা আরও সুদৃঢ় করবার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়ায় আর অংশ নেবে না মস্কো, যেহেতু নয়াদিল্লি গোটা ঘটনাকে ভালো চোখে দেখছে না। একইসঙ্গে রাশিয়ার বক্তব্য পাকিস্তান যে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর এটা তারা বুঝতে পারছে এবং সন্ত্রাস-বিরোধী লড়াইয়ে মস্কো নয়াদিল্লির পাশেই রয়েছে।

রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের যৌথ সামরিক মহড়ায় যাওয়ার ব্যাপারে সেদেশের সামরিক কর্মসূচির চেয়েও কূটনৈতিক কৌশলই দেখছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। গত বছর 'ড্রুজবা' নামাঙ্কিত এই প্রথম রাশিয়া-পাক সামরিক মহড়াটি পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বালটিস্তান এলাকার রাট্টুতে হয়েছে বলে পাক-সংবাদমাধ্যম দাবি করে আসছে। যদিও রাশিয়ার তরফ থেকে এর প্রতিবাদ করে বলা হয়েছিল চেরাটের 'স্পেশাল ফোর্সেস অ্যাকাডেমি'তে এই মহড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যে জায়গাটি যদিও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বেশ নিকটবর্তী। মস্কোর দাবি, মূলত পাহাড়ি এলাকায় ও সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় উভয়বাহিনীকে শক্তিশালী করতেই এই যৌথ সামরিক মহড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই যৌথ মহড়ার সময়ই ঘটে উরির মর্মান্তিক ঘটনা, যার পেছনে পাক-সেনাবাহিনীর ইন্ধন দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। এরপরই রাশিয়া সতর্ক হতে শুরু করে বলে সেদেশের সরকারি সূত্রে দাবি।

যদিও রাশিয়ার এই ভোল-বদলের পেছনে নয়াদিল্লির সফল কূটনৈতিক চালের

পাকিস্তান-রাশিয়ার যৌথ সামরিক মহড়ার একটি দৃশ্য।

মাহাত্ম্যই দেখছেন কূটনীতিজ্ঞরা। তাঁরা মনে করছেন ভারত সফলভাবে রাশিয়াকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে সন্ত্রাসবাদের ছোবল তাদের ঘাড়েও নিঃশ্বাস ফেলছে। বিশেষ করে আইসিস। যারা তালিবান ও অন্য সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সাহায্য নিয়ে অশান্ত করতে চাইছে রাশিয়া-কে। নয়াদিল্লি মস্কোকে বোঝাতে সফল হয়েছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই ধরনের সন্ত্রাসে যেমন কাবুলকে লঞ্চিং প্যাড হিসেবে ব্যবহৃত হতে দিতে পারে না তারা, তেমনি ভারতও তাদের দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে ইসলামাবাদকে লঞ্চিং প্যাড হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারে না। আর এরপরেই রাশিয়ার উপলব্ধি হয়েছে যে 'তাদের সামরিক-বাহিনী স্বচক্ষে দেখেছে পাকিস্তানে বসবাসকারী বহু সন্ত্রাসবাদী ভারতের ক্ষতি করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে।' গত বছরের শেষে গোয়ায় ব্রিকস সম্মেলনে পাকিস্তানের সঙ্গে রাশিয়ার যৌথ সামরিক মহড়া নিয়ে তীব্র আপত্তি জানায় ভারত। মস্কোয় ভারতের রাষ্ট্রদূত পঙ্কজ শরণ রাশিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তারা এমন একটি দেশের সঙ্গে সামরিক মহড়ায় যৌথভাবে অংশ নিচ্ছে যারা সন্ত্রাসের উৎসাহ ও অনুশীলনে বিশেষভাবে আগ্রহী। এতে রাশিয়ার সন্ত্রাস-বিরোধী নীতিও প্রশ্নের মুখে পড়বে এবং সেদেশের সুরক্ষাও বিপন্ন হবে।

ভারতের এই সফল কূটনৈতিক দৌত্যেই সম্বিৎ ফেরে রাশিয়ার। এখন তারা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এদেশের তাদের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার এস গাদাকিন-ই প্রথম উরিতে পাক-হামলার তীব্র নিন্দা করেন এবং ভারতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইককে সমর্থন করেন। পাশাপাশি পাকিস্তানকে রাশিয়ায় এস ইউ-৩৫ লড়াকু বিমান সরবরাহ কিংবা চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরে রাশিয়ার যোগ-সাজশের প্রসঙ্গটি গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে মস্কোর সরকারি সূত্র। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনমনের বিষয়টিও পাক সংবাদমাধ্যমের কল্পনাপ্রসূত বলে মস্কো-সূত্রে দাবি।

অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে হাওড়া- এরনাকুলাম অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস চালু করেছে ভারতীয় রেল। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু সবুজ পতাকা দেখিয়ে এরনাকুলাম স্টেশন থেকে ট্রেনটির শুভ উদ্বোধন করেন। রেলের বিভাগীয় মিডিয়া আধিকারিক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'সারা দেশেই এখন রেলের পুরনো ট্র্যাক বদলে নতুন করা হচ্ছে। কাজ খুব দ্রুত এগোচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই ট্রেনের গতিনিরোধক ব্যবস্থাগুলি ক্রমশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেসের মতো নতুন ট্রেনও চালু করা হবে।' চোখ জুড়িয়ে দেওয়ার মতো চেহারা নিয়ে লোকোমেটিভ ওয়ার্কসের বাইরে এসেছে অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস। প্রতিটি কামরার ভেতরের দেওয়ালে অসাধারণ রঙের বাহার, পতনরোধী ম্যাট পাতা মেঝে, কামরার বাইরের দেওয়ালে মন ভালো করা রেখাচিত্র। সিটে কুশন পাতা, দু'ধারে অ্যালুমিনিয়ামের প্যানেল। প্রতিটা ট্রেনে কুড়িটা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশেষ কোচ। সব থেকে আনন্দ নিত্যযাত্রীদের। দূরে কোথাও গেলে চার মাস আগে ট্রেনের রিজার্ভেশন করাতে হয়। অন্ত্যোদয়ে রিজার্ভেশনের কোনো বালাই নেই। এরনাকুলাম থেকে হাওড়ায় আসতে খরচ হবে যাত্রীপিছু মাত্র ৫২০ টাকা। সস্তায় ভালো ট্রেন দেওয়ার জন্য রেলকে সাধুবাদ জানিয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।

বাঁকুড়ায় সরস্বতী পূজা বন্ধ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৯ ফেব্রুয়ারি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার নজির সৃষ্টি হলো বাঁকুড়া জেলায়। বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর ব্লকের ক্ষীরপাই হাইস্কুলে সাম্প্রদায়িক হিংসায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার সূত্রপাত সরস্বতীপূজাকে কেন্দ্র করে। দীদিন ধরে চলে আসা স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধের দাবি করে স্থানীয় 'সাতসগডা' গ্রামের মুসলমানরা। বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। কিন্তু হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা বলে পরিচিতি ইন্দপুর ব্লক তাই স্থানীয়দের উদ্যোগে পূজো সম্পন্ন হয়। মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা নিজীরবিহীন ভাবে 'জলসা'-র দাবি জানাতে থাকে। স্কুলের পরিচালন সমিতির সম্পাদক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে অভিভাবকদের নিয়ে মিটিংয়ের আয়োজন করেন। মুসলমানরা 'জলসার' দাবিতে অনড় থাকে। বৈঠক চলাকালীন স্থানীয় মুসলমান গুণ্ডারা শতাধিক জনসংখ্যায় স্কুলে আক্রমণ চালায়। প্রধান শিক্ষককে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে একজন ছাত্র জখম হয়। হামলায় ১০ জন হিন্দু ছাত্রের অভিভাবক গুরুতর জখম হয়। হিন্দুরা প্রতিরোধ করতে গেলে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব তাদের বাধা দেয়। প্রশাসন কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যের অন্যতম কারণ মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মাত্রাতিরিক্ত তোষণ নীতি। হাওড়ার 'তেহট্ট হাইস্কুল' অনির্দিষ্টকাল বন্ধ। তার মাঝেই বাঁকুড়ার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা পশ্চিমবাংলার সম্প্রীতি, ঐতিহ্যের উপর চরম আঘাত হানবে সে বিষয়ে নিশ্চিত। বাংলার দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের উৎসব নয়— সমগ্র বাংলার উৎসব, কিন্তু সেই গরিমা আজ কলঙ্কিত। এলাকার মানুষের জিজ্ঞাসা— পশ্চিমবঙ্গ কি নতুন এক বাংলাদেশ গঠনের অভিমুখে?

পাক-সীমান্তে ভারতের স্পাইডার মিসাইল সিস্টেম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তান সীমান্তে যে বিশেষ নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা শুরু করেছিল, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা শেষ হয়ে যাবে। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ইজরায়েলে নির্মিত স্পাইডার এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম। এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবার পর আকাশপথে পাকিস্তানের যে-কোনো হামলা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে ভারতীয় বায়ুসেনা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, এই বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু চেক-প্রজাতন্ত্রে প্রস্তুত ভারী ট্রাক তাতরা ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে না থাকায় এতদিন চালু করা যায়নি। বায়ুসেনার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, 'ভারতের পশ্চিম সীমান্তে স্পাইডার মিসাইল সিস্টেম চালু করা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। একবার এই সিস্টেম হাতে এসে গেলে আমরা পাকিস্তানের বিমান, ক্রুজ মিসাইল, ড্রোন শুধু যে প্রতিরোধ করতে পারব তাই নয়, ধ্বংসও করতে পারব।'

স্পাইডার অত্যন্ত দ্রুত প্রতিক্রিয়ার মিসাইল। এই মিসাইল কুড়ি মিটার দূরত্বের মধ্যে এবং ২০ থেকে ১০০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে যে কোনো লক্ষ্যবস্তুকে নিমেষের মধ্যে ধরাশায়ী করতে পারে। আকাশ থেকে আকাশ শ্রেণীর মিসাইলের মধ্যে পাইথন-৫-ই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। প্রতিরক্ষা সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভারতীয় বায়ুসেনা ভারতে নির্মিত মাটি থেকে আকাশ শ্রেণীর ক্ষেপণাস্ত্র আকাশের সঙ্গে একযোগে স্পাইডারকে ব্যবহার করবে। এর ফলে আরও অতিরিক্ত ২৫ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত আর কিছুদিনের মধ্যেই রাশিয়ার কাছ থেকে এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম পেয়ে যাবে। এই সিস্টেমে ছোড়া বিশেষ ক্ষেপণাস্ত্র ৪০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে যে-কোনো লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে পারে।

আশঙ্কা অর্থনীতিবিদদের

দেউলিয়া হওয়ার পথে পশ্চিমবঙ্গ?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ক্রমশ কি দেউলিয়া হওয়ার পথে এগোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার? অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা তেমনই। সম্প্রতি বাজার থেকে আরও তিন হাজার কোটি টাকা ঋণ করতে বাধ্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ফলে চলতি আর্থিক বছরেই এরাজ্যের ধারের পরিমাণ বেড়ে ৩২ হাজার কোটিতে পৌঁছে গিয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বাজার থেকে ৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ যোলোটি ঋণগ্রস্ত রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করছে। ঘটনাচক্রে, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ইতিমধ্যেই তাঁর রাজ্য বাজেট পেশের সময় আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ৪৪ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা ঋণ করতে হবে বলে গাওনা গেয়ে রেখেছেন। তাঁর যুক্তি সরকারের খরচ বাড়ছে হু হু করে, তাই ধার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রসঙ্গত, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ১৯৫০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশ বাম সরকারের আমলে নেওয়া। কিন্তু ক্ষমতায় এসে তৃণমূলও গতানুগতিকতায় গা তো ভাসালোই, উপরন্তু দান-খয়রাত আর পাইয়ে দেওয়ার নীতিতে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তুলেছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, একদিকে রাজ্যে শিল্প-বিনিয়োগের শোচনীয় অবস্থা, অন্যদিকে রাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক ব্যর্থতা অর্থনীতির দিক দিয়ে রাজ্যকে খাদের কিনারায় নিয়ে গিয়েছে।

উবাচ

"আমার মতে, যাঁরা ইতিমধ্যেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্থিক আদানপ্রদান শুরু করেছেন তাঁরাই দেশের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের প্রধান কারিগর। দেশে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, আমরা তাঁদের যোদ্ধাও বলতে পারি।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসার প্রসঙ্গে।

"অপরাধমনস্ক কিছু মানুষ আমাদের যুবসমাজকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করছে। তাদের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের আবেগে আঘাত করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা। ...কারও অন্য মত থাকতেই পারে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতের সঙ্গে সেই মত নাও মিলতে পারে। কিন্তু দেশের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর এমন কোনো মত বা আদর্শ পোষণ করা উচিত নয়।'"

বেঙ্কাইয়া নাইডু
কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ফেসবুকে শহিদ কন্যা গুরমেহর কৌরয়ের মন্তব্য প্রসঙ্গে।

"আজকাল সকলেই ঘুম থেকে উঠে বলে— চলো, সুপ্রিম কোর্টে যাই। অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই।"

জে. এস. কেহর
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

একটি জনস্বার্থ মামলায় রায়দান প্রসঙ্গে।

"সরকার ইসলামিক স্টেটকে কড়া নজরে রেখেছে। ভারতের সংহতি এবং নিরাপত্তা নিয়ে কোনোভাবেই তাদের ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না।"

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

গুজরাটে দুই আই এস জঙ্গির গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে।

বিপুল সংখ্যায় সাংবাদিক ছাঁটাইয়ে নীরব কলকাতার সাংবাদিকরা

সারা দেশে সাংবাদিকরা এখন ঘোর সঙ্কটে পড়েছেন। সংবাদমাধ্যমের কর্তারা বিপুল সংখ্যায় সাংবাদিকদের ছাঁটাই করছেন। প্রতিবাদে টুঁ শব্দটি করলে নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে ঘাড় ধরে অফিস থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকা এবং দ্য টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ৭৫০ জন সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক কর্মীকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছেন। তাঁদের কাজ কেন কেড়ে নেওয়া হলো কর্তৃপক্ষ তার কারণ জানাবার সৌজন্যটুকুও দেখাননি। এই পত্রিকা গোষ্ঠীর বাঁকুড়া, শিলিগুড়ি, পাটনা, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি অফিসে কর্মরত সাংবাদিকদেরও ব্যাপকভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর ৪০ শতাংশ কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। জানা গেছে যে গোষ্ঠীর মোট ১২০০ কর্মীর মধ্যে ৫২ শতাংশকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে বিপুল লোকসানের ধাক্কা সামলাতে কর্মী সংখ্যা কমাতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। গুজব ছড়ানো হচ্ছে সাম্প্রতিক বিমুদ্রীকরণের জন্য নাকি এই সংবাদপত্র গোষ্ঠীর মালিকরা লোকসানের কবলে পড়েছেন এবং তাই কর্মী ছাঁটাই করতে হচ্ছে। অর্থাৎ মমতার রাজনীতির সুরে সুর মিলিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর মালিকরা সাংবাদিকদের ছাঁটাই করেছেন। সব দোষ মোদীজী এবং বিজেপির। এসব ডাহা মিথ্যা। আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর মুনাফা কীভাবে বাড়ানো যায় তার হদিশ পেতে একটি মার্কিন পরামর্শদাতা সংস্থা, 'হে কনসালটেন্সি লিমিটেড'-কে গত বছরের মাঝামাঝি নিয়োগ করে এবিপি কর্তৃপক্ষ।

গত বছরের শেষদিকে মার্কিন পরামর্শদাতা সংস্থাটি কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের পরামর্শ দেয়। পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রধান সম্পাদক অভীক কুমার সরকার ছাঁটাই নীতির ব্যাপারে আপত্তি জানালে তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়, বিধানসভার নির্বাচনে মমতা এবং তাঁর দল তৃণমূলের বিরোধিতা করার জন্য সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি সরে দাঁড়ালে আবার সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, অভীকবাবু সরে দাঁড়ানোর পর আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী পুরোদমে রাজ্য

গূঢ় পুরুষের কলম

সরকারের বিজ্ঞাপন পাচ্ছে। শর্ত হচ্ছে, কাগজে বা এবিপি আনন্দ টিভি চ্যানেলে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দলের নেতাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা যাবে না। প্রতিদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্মের 'পজিটিভ নিউজ' দিতে হবে। পজিটিভ নিউজের অর্থ মমতা বন্দনার ফুলঝুরি ছোটাতে হবে। যে রিপোর্টাররা নির্বাচনের সময় তৃণমূলের নেতাদের ঘুষকাণ্ড নিয়ে লেখালেখি করেছিলেন তাঁদের সবাইকে ছাঁটাই করা হয়েছে। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে আগাম কথা বলেই কর্তৃপক্ষ ছাঁটাইয়ের স্টিমরোলার চালাচ্ছেন।

মোদীজীর নোট বাতিল সিদ্ধান্তের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিল্লির হিন্দুস্থান টাইমস কর্তৃপক্ষ আর্থিক লোকসানকে শিখণ্ডী খাড়া করে ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা, এলাহাবাদ, বারাণসী ও কানপুরে তাঁদের অফিস বন্ধ করে দিয়েছেন। কাজ হারিয়েছেন এই চারটি অফিসে কর্মরত সব সাংবাদিক। টাইমস অফ ইন্ডিয়া কর্মী ছাঁটাই না করলেও কর্মী নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে। মোদীজী নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কালোটাকার রমরমা বন্ধ করতে। প্রশ্ন হচ্ছে, সংবাদমাধ্যমের পরিচালকরা কী কালোটাকার কারবারি? দেশের অন্য কোনো শিল্পসংস্থা লোকসানের অজুহাতে এমন ব্যাপকভাবে কর্মী ছাঁটাই করেনি। সবচেয়ে বেশি সঙ্কটে পড়েছেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত চিত্রসাংবাদিকরা। রিপোর্টারদের বলা হচ্ছে মোবাইল ফোনে ছবি তুলতে। দিল্লির জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল এন ডি টিভি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই ৩৮ জন ক্যামেরাম্যানকে বরখাস্ত করেছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এত ভয়ানক অন্ধকার সময় বিগত শতবর্ষে আসেনি।

ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্যথিত কারণ কলকাতায় সাংবাদিকদের তিনটি প্রধান সংগঠন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশানাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস এবং প্রেস ক্লাবকে নীরব দেখে। কেউ প্রতিবাদ সভা বা নিন্দা করে বিবৃতি দেয়নি। দেশের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রগুলিতে ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে একটি লাইন লেখা হয়নি। কেন? আতঙ্কে? আমার জানা নেই। একটা ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তা কলকাতার সাংবাদিকদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যখন পিছন ফিরে তাকাই তখন মনে পড়ে কলকাতার সাংবাদিকরা বিহার প্রেস বিলের বিরুদ্ধে রাজপথে মিছিল করেছিলেন। মহাকরণে প্রেস কর্নার ভেঙে দেওয়ার বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। নেতৃত্বে ছিল কলকাতা প্রেস ক্লাব। আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পত্রিকা গোষ্ঠীর মালিক প্রয়াত অশোক কুমার সরকার কর্মীসভা করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বন্ধ কাগজের একজন কর্মীরও চাকরি যাবে না। আমরা আবার নতুন নামে নতুন কাগজ বার করবো।

অশোকবাবু তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি দৈনিক 'দ্য টেলিগ্রাফ'। আজ সেই দৈনিক থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সাংবাদিকদের বার করে দিচ্ছেন তাঁরই পুত্র পৌত্ররা। আনন্দবাজার পত্রিকা এবং দ্য টেলিগ্রাফের প্রচারসংখ্যা বেড়েছে, কমেনি। বিজ্ঞাপন বেড়েছে। তারপরেও বলা হচ্ছে বিপুল লোকসানে চলছে। বিশ্বাস করতে পারছি না। ■

ও দিদি, তুমি কি অন্ধ গো?

মাননীয় মদন মিত্র

প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন বিধায়ক, প্রাক্তন নেতা

প্রথম দুটি সম্বোধনে রাগ না করলেও তৃতীয়টিতে মদন-দা আপনি রেগেছেন আমি জানি। কিন্তু মেনে নিন। কারণ, ওটাই আপনার ভবিতব্য। দিদি আপনাকে আর ডানা মেলতে দিতে চান না। আপনার হয়েই তাই দিদিকে আমার প্রশ্ন—ও দিদি, তুমি কি অন্ধ গো?

হ্যাঁ দিদি অন্ধ। ভাইপোর প্রতি স্নেহে অন্ধ। আপনার সব ডানা ঝাপটানো মেনে নিতে পারতেন কিন্তু যুব সভাপতির দিকে আপনি আঙুল তুলতে গেলেন কেন? ও যে, বাংলার রাহুল গান্ধী।

দীর্ঘ বাধ্যতামূলক 'বাণপ্রস্থের' পরে কিছুদিন ধরেই রাজনীতির অঙ্গনে একটু একটু করে আবার পা রাখছিলেন আপনি। ভেবেছিলেন এবার সত্যিই সেই পা পড়ল বেশ শক্ত জমিতে। কিন্তু সেটা কি মেনে নেবেন তৃণমূলনেত্রী? আবার রাজনীতির মূলস্রোতে ফিরিয়ে নেবেন মমতা? আপনি যখন হাসপাতাল নিয়ে দাপাচ্ছিলেন তখন দাদা, আমি এই কথাটাই ভাবছিলাম। সত্যিই দেখলাম আপনাকে আবার ব্রাত্য প্রমাণ করে দিলেন।

একই ঘটনা দেখেছি সিঙ্গুর আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে যোগ করার ক্ষেত্রেও। আন্দোলনের সময় রাত জাগাই সার, সিঙ্গুরের ইতিহাসে ঠাঁই পেলেন না আপনি। অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ে সিঙ্গুর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিসেবে তৃণমূলের একগুচ্ছ নেতা-মন্ত্রীর নাম থাকলেও প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রের উল্লেখ নেই। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওই বইয়ে রয়েছে— 'ছিলেন তপন দাশগুপ্ত, শোভন চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সি, মুকুল রায়, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বেচারাম মান্না'। অথচ আপনি প্রথম থেকেই সিঙ্গুরের আন্দোলনে ছিলেন। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে ধরনামঞ্চ চলাকালীন আপনার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। আপনার নাম না থাকাটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

সেদিন মানে শিবরাত্রির দিন আপনাকে আমার হেব্বি লেগেছে। মনে হয়েছে, শুধু রাজনীতিক নন, আপনি 'ঝানু' রাজনীতিক। আপনি জানেন, কখন কোন ইস্যুকে কাজে লাগাতে হয়। কীভাবে কাজে লাগাতে হয়। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমে লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালের কর্তাদের দাঁড় করিয়ে ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে তার বেশ ভাল প্রভাব পড়ে। আর সেই লোহা গরম থাকতে থাকতেই তাতে হাতুড়ির ঘা দিলেন সেদিন।

সেদিন দেখলাম অনেক দিন না দেখা দৃশ্য। কমলা রঙের পাঞ্জাবি। চোখের সানগ্লাস মাথার উপরে তোলা। চারিদিকে অনুগতদের ভিড়। মোবাইল ফোন কানে নিয়ে উত্তপ্ত ভঙ্গিতে কথা বলছেন মদন মিত্র। ফোনে অ্যাপোলো কর্তৃপক্ষকে মদন মিত্র বলছেন, 'হাসপাতাল চালানোর নামে শ্মশান খুলে রেখেছেন আপনারা। আপনাদের সিইও বারবার হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন। ওনাকে বলুন, শ্মশান খুলে রাখার থেকে অন্য কোথাও চলে যান আপনারা। এর থেকে আমাদের কেওড়াতলা শ্মশান ভাল। কাল থেকে হাসপাতালের সামনে হোর্ডিং দেখতে চাও? যাঁর বাড়ির ছেলে চলে গিয়েছে, তাঁদেরকে আমি বিচারের বাণী শোনাবো? তোমাদের শ্মশান বন্ধ হলে আমরা খুশিই হব।'

বুঝতে পারছি চিরকাল রাজনীতি করে, দাদাগিরি করে আসা আপনি হাঁপিয়ে গিয়েছেন। ভুলেই গেছেন যে আপনি আর কেউ নন। বিধায়ক কিংবা মন্ত্রী না হয়েও কামারহাটিতে গিয়ে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তৃণমূলের সভায় গিয়ে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তৃণমূলের সভায় গিয়ে আপনি বলেছেন, কামারহাটি পিছিয়ে পড়ছে। এলাকাবাসীর জন্য হেল্পলাইন চালু করবেন। ডানলপের আন্ডারপাসের সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে। তৈরি হবে 'কটন হাব'। সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল রোগীদের অন্যত্র রেফার করছে বলে কাউন্সিলরদের নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করবেন। একই সঙ্গে বিধায়ক হওয়ার বাসনায় সিপিএম বিধায়ক মানস মুখোপাধ্যায়কে পদত্যাগ করে ফের ভোটে লড়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, মদন মিত্র কি সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে চাইছেন? আপনি বলেছেন, 'সে সব নয়। মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।'

কিন্তু দিদির হাত কি আর আদৌ আপনার মাথার উপরে আছে? আপনিই তো জেলে বসেছিলেন, কামারহাটিতে আপনাকে হারাতে পুলিশ প্রশাসনের একাংশ কাজ করেছে। কার নির্দেশে সেটা হয়েছিল মদন দাদা?

আপনি যে দিদির প্রাক্তন ছায়াসঙ্গী তাঁকে আপনার থেকে ভালো কে চেনে?

—সুন্দর মৌলিক

মরণকালে হরিনামের মতো বামেদের গান্ধীনাম স্মরণ

সাধন কুমার পাল

এবারই প্রথম বার ৩০ জানুয়ারি দিনটি সিপিএমের নেতৃত্বে রাজ্যের ১৭টি দলের বাম ও সমাজতান্ত্রিক জোট 'গান্ধী হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করল। গান্ধীজীর ছবি নিয়ে সিপিএমের নেতৃত্বে বামেদের মিছিল! খটকা লাগতে পারে অনেকেরই। বক্তব্যের শুরুতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রের মুখেই উঠে এল সেই খটকার কথা। সিপিএমের এই শীর্ষ নেতা বলেন, 'অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন যে এতদিন পর হঠাৎ আমরা গান্ধীজীর মৃত্যু দিনটিকে সম্প্রীতি মিছিলের জন্য বেছে নিলাম কেন? আমরা স্পষ্ট বলছি, আমরা গান্ধীবাদী নই। গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে আমাদের বিস্তর ফারাক ছিল, এখনো আছে। এই মতপার্থক্য মুছে যাওয়ার নয়। কিন্তু আমরা বরাবরই বলছি যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ওঁর মস্ত বড় ভূমিকা আছে। এই ধরনের মানুষকে যারা হত্যা করে তারা সুস্থ সমাজের জীব নয়। আমরা তাই এই এই দিনটিকে গান্ধীজীর মৃত্যুদিবস নয় হত্যা দিবস হিসেবেই মনে করি।'

সূর্যবাবুর বক্তব্যে পরস্পর বিরোধিতা ও কোমায় চলে যাওয়া নিজের দল সিপিএমকে অক্সিজেন জোগানোর মরিয়া প্রয়াস স্পষ্ট। কারণ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এটাই রাজনৈতিক সত্য যে রাজ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিজেপি দ্রুত প্রভাব বিস্তার করার জেরে সঙ্কটাপন্ন সিপিএমের সঙ্কট আরো ঘনীভূত হচ্ছে। কোনোরকম বামপন্থী দাওয়াই দিয়ে যে এই সঙ্কট মোচন হওয়ার নয় সেটা সাম্প্রতিক কালের সমস্ত নির্বাচনেই প্রমাণ হয়ে গেছে। ফলে এই কর্মসূচিতে মরণকালে হরিনামের মতো গান্ধী নাম স্মরণ করে এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজার প্রয়াসও স্পষ্ট।

এটা নিঃসন্দেহে ভালো দিক যে সূর্যকান্তবাবুরা সাত দশক পরে হলেও সর্বসমক্ষে অন্তত এইটুকু মানলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর মস্ত বড় ভূমিকা ছিল। পরক্ষণেই আবার গান্ধীবাদী তকমা লেগে যায় এই ভয়ে এটাও জানাতে ভুলবেন না 'আমরা স্পষ্ট বলছি, আমরা গান্ধীবাদী নই'। গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে বিরাট ফারাক ছিল যা এখনো আছে। এই মতপার্থক্য মুছে যাওয়ার নয়। এই ফারাকটা কতটা তা বুঝতে ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখতে হবে।

শুধু গান্ধীজী নন, বহু শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে কটাক্ষ করা কমিউনিস্টদের কদর্য আক্রমণের হাত থেকে সে সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো জাতীয় স্তরের কোনো নেতাই বাদ যায়নি।

যে সময়টিতে সমস্ত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে মধ্যগগনে সূর্যের মতো গান্ধীজীর উপস্থিতি অনুভব করছিল সে সময় তিনি কমিউনিস্টদের যাবতীয় আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির নানা প্রচারপত্রে ভণ্ড, সুযোগ-সন্ধানী, ফ্যাসিস্টদের দালাল প্রভৃতি নানা বিশ্লেষণের সঙ্গে অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ ব্যঙ্গচিত্রও আঁকা হোত গান্ধীজীকে নিয়ে। ২ আগস্ট ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরুর দিন সাতেক আগে পিপলস্ ওয়ার পত্রিকায় 'গান্ধীর দুর্গে কমিউনিস্ট ঝড়' শিরোনামে লেখা হয়েছিল— গান্ধীর পথ দেশকে পরাধীনতার গ্লানিতে নিমজ্জিত করবে এবং দেশকে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের কাছে উন্মুক্ত করবে। রাশিয়া ও চীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই দেশকে রক্ষার সঠিক পথ। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'পিপলস্ ওয়ার' এর ২৭ সেপ্টেম্বরে ১৯৪২ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল— এই ভারত ছাড়ো আন্দোলন নৈতিক ও বাস্তবিক ভাবে দেশকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও পঙ্গু করে দিচ্ছে। যার ফলে জনসাধারণ স্বাধীনতা তো পাবেই না, বরং আক্রমণকারীর পথই প্রশস্ত হবে।' শুধু গান্ধীজী নন, বহু শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে কটাক্ষ করা কমিউনিস্টদের কদর্য আক্রমণের হাত থেকে সে সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো জাতীয় স্তরের কোনো নেতাই বাদ যায়নি।

গান্ধী হত্যা নিয়ে ভারতে বছরের পর বছর ধরে যত কাটাছেড়া হয়েছে স্বাধীনোত্তর ভারতে আর কোনো ঘটনা নিয়ে এতটা হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। হত্যাকারী নাথুরাম গডসের আদালতে দেওয়া বয়ান-সহ বাজারে গান্ধীহত্যা মামলা সংক্রান্ত তথ্যনির্ভর বইয়ের অভাব নেই। এগুলি অধ্যয়ন করলে যে কেউ বুঝতে

পারবেন জওহরলাল নেহরু বিশুদ্ধ রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়েই গান্ধীজীর হত্যা কাণ্ডের সঙ্গে আর এস এস-কে জড়িয়েছিলেন। ঘটনার তিন দিন পরে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি নেহরু সরকার সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডে আর এস এস-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণের জন্য জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে গঠিত হয়েছিল জাস্টিস কাপুর কমিশন। সঙ্ঘের বিরুদ্ধে আনা কোনো অভিযোগই আদালতে প্রমাণ হয়নি।

অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নেহরু সরকার সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালে ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রণালয় জওহরলাল নেহরুর গড়া কাপুর কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে যাতে বলা হয়েছে— 'RSS as such were not responsible for the murder of Mahatma Gandhi, meaning thereby that one could not name the organisation as such as being responsible for that most diabolical crime, the murder of the apostle of peace. It has not been proved that they (the accused) were members of the RSS.'

নেহরুর উত্তরসূরী কংগ্রেস নেতারাও বিভিন্ন সময়ে গান্ধী হত্যার সঙ্গে সঙ্ঘকে জড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এই নিয়ে অতীতে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে করা মামলায় আদালতের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিষ্কৃতি পাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। গান্ধীহত্যা নিয়ে বেফাঁস কথা বলার অভিযোগে একটি মামলায় রাহুল গান্ধী এখনো আদালতে হাজিরা দিয়ে চলেছেন। রাজ্য রাজনীতিতে হারিয়ে যেতে থাকা সিপিএম নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলতে নেহরুর তৈরি করা সেই ভোঁতা হয়ে যাওয়া অস্ত্র নিয়ে সঙ্ঘ ও বিজেপির বিরুদ্ধে মাঠে নামার চেষ্টা করছে।

ভারতের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক জন্ম ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর। আর এস এস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯২৫-এর ২৭ সেপ্টেম্বর। গত ৯০ বছরে কমিউনিস্ট পার্টি লাল, অতি লাল, ফিকে লাল ভাবমূর্তির পরস্পর বিবদমান নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছে। আঞ্চলিক ভাবে দু' একটি জায়গা ছাড়া সর্বভারতীয় মানচিত্রে এদের কোনো গোষ্ঠীই জায়গা করে নিতে পারেনি। গান্ধীজীর উত্তরাধিকারের দাবিদার কংগ্রেস দলও বলতে গেলে এখন আঞ্চলিক দলে পরিচিত। বর্তমান ভারতে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মরত সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠনগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে এদের সিংহভাগই সঙ্ঘ পরিবারের। সঙ্ঘের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এই সমস্ত সংগঠনের শক্তিই বলে দেবে গত ৯০ বছরে সর্বভারতীয় স্তরে আর এস এস কতটা শক্তি অর্জন করেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যাভারতী, ছাত্র রাজনীতিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, কৃষিক্ষেত্রে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিবেকানন্দ আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী, গিরিবাসী-বনবাসীদের মধ্যে কর্মরত বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, দেশজুড়ে নরনারায়ণের সেবায় উৎসর্গীকৃত কয়েক লক্ষ সেবা প্রকল্পের পরিচালক সেবা ভারতী, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মতো সংগঠনগুলিই যে বর্তমান ভারতে সবচেয়ে প্রভাবশালী একথা সঙ্ঘের ঘোর বিরোধীরাও অস্বীকার করবেন না। গত ৯০ বছরে শুধু কমিউনিস্ট পার্টি নয় কংগ্রেসও ভেঙে পরস্পর বিবদমান বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কিংবা মত পার্থক্যের জেরে সঙ্ঘে কোনো বিভাজন আসেননি, বরং সঙ্ঘের ভাবাদর্শে একে অপরের পরিপূরক নতুন নতুন সংগঠন জন্ম নিয়েছে। এখনো নিচ্ছে। এজন্যই গবেষক বিশ্লেষকদের কাছে সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি বিস্ময়। শক্তি অর্জনের সূচকে বিচার করলে বলতে হবে আর এস এস এখনো একাদশীর একফালি চাঁদের মতো ক্রমবর্ধমান শক্তি। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি এখন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো ক্রমহ্রাসমান শক্তি।

চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আদর্শ হিসেবে হিন্দুত্বকে ছাড়েনি। সঙ্ঘের অটুট জীবনীশক্তির উৎসও এই হিন্দুত্ব। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব সমার্থক। হিন্দুত্ব মানে বিশেষ কোনো উপাসনা পদ্ধতি নয়, একটি জীবনধারা। এ জন্যই সঙ্ঘের ভাবাদর্শে রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চের মতো সংগঠন গড়ে উঠতে কোনো সমস্যা হয়নি।

একটু বিচার বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে রাম রাজ্যের প্রবক্তা গান্ধীজীর জীবন ও আদর্শ থেকে হিন্দুত্বকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সেজন্য রাজনৈতিক কারণে সঙ্ঘকে যতই গান্ধী হত্যার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা হোক না কেন আদর্শগত কারণেই সঙ্ঘ মনেপ্রাণে গান্ধীজীকে যতটা শ্রদ্ধা করে ব্র্যান্ডেট গান্ধী ভক্তরাও এতটা করে কিনা সন্দেহ। প্রতিদিন ভোরবেলা সঙ্ঘে যে একাত্মতা স্তোত্র পাঠ করা হয় তাতে অন্যান্য মহাপুরুষের সঙ্গে সমান শ্রদ্ধা-সহ গান্ধীজীকেও স্মরণ করা হয়।

সূর্যবাবু স্পষ্ট করেই বলেছেন, সিপিএমের চোখে গান্ধীজী এখনো একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছাড়া অন্য কিছু নন। গান্ধী ভারতে এবং বিশ্ব জুড়ে মহাত্মা নামে পরিচিত। সরকারি ভাবে তাঁকে ভারতের জাতির জনক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২ অক্টোবর তাঁর জন্মদিন ভারতে গান্ধী জয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। ২০০৭ সালের ১৫ জুন জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ২ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সিপিএমের এই দায়সারা গান্ধীভক্তি আবার সেই পুরনো ইতিহাসকে খুঁচিয়ে তুলবে না তো? সেক্ষেত্রে দু'পা এগোনোর বদলে কয়েক যোজন পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভবনাই বেশি। সঙ্ঘ ও বিজেপির বিরুদ্ধে ছোড়া গান্ধী হত্যার মতো ভোঁতা অস্ত্র সিপিএমের বিরুদ্ধে ধারালো হয়ে বুমেরাং হবে না তো?

■

নগদহীন অর্থনীতি
শেষ শয্যায় দুর্নীতি

অম্লানকুসুম ঘোষ

কোনো নিস্তরঙ্গ পুষ্করিণীতে ইট ফেললে যেমন সেই পুষ্করিণীর জল তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে, বর্তমানে আমাদের দেশের অর্থনীতি সেরকমই বিমুদ্রীকরণ-পরবর্তী প্রস্তাবিত ক্যাশলেস অর্থনীতির অভিঘাতে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। ক্যাশলেস অর্থনীতির স্বরূপ কেমন? তা দেশের পক্ষে আদৌ উপকারী কিনা? দেশের সিংহভাগ জনসাধারণ সেই অর্থনীতির ওপর নির্ভর করতে পারবেন কিনা? এই ধরনের নানান প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে অর্থনীতিবিদ, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের এবং সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে। সেইসব কৌতূহলের নিরসন ঘটাতে আর অদূর ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ক্যাশলেস বা নগদহীন অর্থনীতির একটা প্রকৃত চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরতে এই অর্থনীতির নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

আদিম যুগের বিনিময় প্রথার অবসান ঘটার পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মুদ্রা অর্থাৎ নগদ অর্থই ছিল মানবসমাজের পারস্পরিক বস্তু ও পরিষেবা বিনিময়ের প্রধান উপকরণ। বর্তমানে এই মাধ্যম বন্ধ করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পারস্পরিক বস্তু ও পরিষেবা বিনিময় চালু করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। কারণগুলি ক্রমানুসারে দেখা যাক।

প্রথমত, নগদনির্ভর অর্থনীতিতে অর্থের প্রাথমিক উৎস নিয়মিত নজরদারির আওতায় থাকলেও সেই অর্থের সামগ্রিক অর্থনীতিতে পরিভ্রমণ নজরে রাখা যায় না। ফলে দুর্নীতির সুযোগ থাকে আর গোপনে সংগঠিত সেই সব দুর্নীতি সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, 'ক'-বাবু নগদনির্ভর অর্থনীতিতে মাসে ত্রিশ হাজার টাকা বেতন পান। সেই বেতন অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারের দ্বারা তাঁর অ্যাকাউন্টে এল এবং তিনি মাসের প্রথমে সেই পরিমাণ অর্থ নগদে তুলে নিলেন। এই পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি সরকারি নজরদারির মধ্যে রইল, কিন্তু এর পরে সেই অর্থ নিয়ে তিনি কী করলেন তা সরকারি নজরদারির আওতায় থাকল না। সেই অর্থ নিয়ে তিনি রাজ্য সরকারি অফিসে গেলেন নিজস্ব কোনো কাজে, সেখানকার কর্মী 'গ' বাবু সেই কাজটি করার জন্য হাজার টাকা চাইলেন। 'ক'-বাবু নগদে হাজার টাকা দিলেন, এক্ষেত্রে 'গ'-বাবুর উপার্জন এই হাজার টাকা সরকারি নজরদারির বাইরে থাকল, এতে দু'রকম ক্ষতি হলো। প্রথমত, এই অসৎ পথে উপার্জন আর তজ্জনিত অসৎ কর্ম সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকল ফলে তা প্রতিরোধ করার তেমন কোনো পথ রইল না। দ্বিতীয়ত, 'গ'-বাবুর প্রকৃত উপার্জন জানা না থাকায় সরকার প্রাপ্য আয়কর থেকে বঞ্চিত হলো। বিপদ আরো আছে, রাজ্য সরকারি দপ্তর থেকে বেরিয়ে 'ক'-বাবু গেলেন একটি দোকানে। দরাদরি করে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস কিনলেন এবং নগদে দাম দিলেন হাজার টাকা, সেই হাজার টাকার রসিদ নিলেন (সকলে নেন না)। দোকানদার কিন্তু দরাদরি সত্ত্বেও 'ক'-বাবুকে ঠকালো এবং আটশো টাকার জিনিস এক হাজার টাকায় দিল এবং সরকারকে দেখাবার জন্য আলাদা রসিদ তৈরি করল। এতে ক্ষতি হলো দ্বিবিধ। প্রথমত, 'ক'-বাবু ঠকলেন, পরবর্তীকালে যদি 'ক'-বাবু বোঝেন যে তিনি ঠকেছেন (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বোঝেন না) তাহলে তাঁর হাতে থাকা রসিদ নিয়ে দীর্ঘ আইনি পথ পরিক্রমার পরে হয়তো সেই প্রতারণার জবাব দিতে পারবেন কিন্তু সে পথ বড়ই বন্ধুর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয়ত, সরকার দোকানদারের আয় জানতে পারলো না, ফলে ন্যায্য কর থেকে বঞ্চিত হলো। এই দু'রকম বিপদেরই কিছু উপজাত বিপদ আছে। রাজ্যসরকারি কর্মীটি তার অবৈধ উপার্জনের একটা ভাগ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকে দিল। সেই দেওয়াও নগদে। ফলে রাজনৈতিক নেতার আয়ও হলো কালো টাকায়, অর্থাৎ নগদে অর্থাৎ সরকারের নিয়ন্ত্রণের ও প্রতিরোধের ক্ষমতার বাইরে। অসৎ দোকানদার তার লভ্যাংশের একটা ভাগ দিল পাড়ার তোলাবাজকে। সেই দেওয়াও নগদে। ফলত, একইভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধের বাইরে। প্রথমোক্ত 'ক'-বাবু যদি নিরীহ ভালোমানুষ হন তাহলে হয়তো দুর্নীতির এখানেই শেষ, কিন্তু 'ক'-বাবুর অন্য কোনো অসদুদ্দেশ্য থাকলে নগদনির্ভর দুর্নীতি তার শাখাপ্রশাখা আরও বিস্তৃত করে। কোনো ব্যক্তিকে মারার জন্য ভাড়াটে খুনি নিযুক্ত করলেন 'ক'-বাবু, সেই নগদে অর্থাৎ একইভাবে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

এই দুর্নীতিগুলি একটি ছোট উদাহরণে হাজারের হিসেবে দেখানো হলেও সময়ান্তরে এই দুর্নীতির ক্ষুদ্র অঙ্কুর কত বড় মহীরুহ হতে পারে তা দেখা যাক। 'ক'-বাবু এবং অসৎ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ঘটা অবৈধ লেনদেন ঠিকাদার ও আমলার মধ্যে হওয়া কয়েক হাজার কোটির লেনদেনে পর্যবসিত হতে পারে। আর দোকানদার-মস্তানের অবৈধ

লেনদেন ঠিকাদার ও উগ্রপন্থীর মধ্যে হওয়া অযুতের বিনিময়ে পর্যবসিত হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। অর্থাৎ ঠিকাদার-মস্তান (কখনও উগ্রপন্থী)— রাজনৈতিক এই দুর্নীতির দুষ্টচক্র (যে দুষ্টচক্রের মাধ্যমে সরকারের অর্থাৎ জনসাধারণের সমস্ত টাকা খরচ হয়) বজায় রয়েছে সম্পূর্ণরূপে নগদনির্ভর অর্থনীতির কারণেই।

দেখা যাক নগদহীন অর্থনীতিতে এই পরিস্থিতির কী পরিবর্তন হোত। 'ক'-বাবু নগদহীন ব্যবস্থায় বেতন নিজের অ্যাকাউন্টে পেতেন কিন্তু হাতে টাকা পেতেন না— কোনোরকম অন্তর্জালিক পদ্ধতিতে সেই টাকা অন্য ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে দিতে পারতেন মাত্র। অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীকে উৎকোচ দিতে হলে তা সেই কর্মচারীর অ্যাকাউন্টেই একমাত্র দেওয়া যাবে, যে অ্যাকাউন্টের হিসেব সরকারের কাছে থাকবে। সরকার অর্থাৎ আয়কর বিভাগ তখন সেই উৎকোচ গ্রহণকারী সরকারি কর্মচারীকে সেই আয়ের উৎস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করবে (অর্থনীতির বৃহৎ দৃষ্টিতে ঠিকাদার— আমলা লেনদেনের ইতি ঘটলো)। দোকানদারকেও 'ক'-বাবু অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারের দ্বারা বিক্রীত পণ্যের দাম দেবেন। ফলে দোকানদারের আয়ও সরকারের নিয়ন্ত্রিত নজরদারির মধ্যে থাকবে। সেই আয়ের থেকে সঠিক আয়কর আদায় করে সরকারি অর্থভাণ্ডার শক্তিশালী হবে এবং আয়ের উৎসের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে ক্রেতাসুরক্ষার (অর্থাৎ বিক্রীত পণ্যের সঠিক দাম নেওয়া হয়েছে কিনা) বিষয়টিও সরকার নিয়ন্ত্রণে রাখবে। আবার দোকানদার যখন মস্তানকে তোলা দিচ্ছে তাও তাকে দিতে হবে অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারের মাধ্যমেই। সেখানেই প্রশ্ন উঠবে (সরকারের দ্বারা) আয়ের কারণ ও উৎস সম্বন্ধে এবং এই দুর্নীতিও হবে দূরীভূত (অর্থাৎ ঠিকাদার-মস্তান/ উগ্রপন্থীর বিরাট চক্রনাশ হবে)। অর্থাৎ দুর্নীতির সম্পূর্ণরূপে মূলোচ্ছেদ সম্ভব হবে নগদবিহীন অর্থনীতির দ্বারাই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নগদহীন অর্থনীতিতে কি স্বচ্ছন্দ হতে পারবে আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ। যে দেশের ৩০ শতাংশ মানুষ এখনও নিরক্ষর। বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি অধিকাংশ গ্রামে, সেই দেশের মানুষ নগদহীন অর্থনীতির সঙ্গে একাত্ম হবেন কীভাবে? প্রশ্ন আরও আছে, বিশ্বজোড়া সাইবার অপরাধের এই যুগে নগদহীন অর্থনীতি কতটা নিরাপদ? উত্তরের সন্ধান করা যাক্। প্রথমত, নগদহীন অর্থনীতি প্রয়োগ করতে যে ন্যূনতম প্রযুক্তিবোধের প্রয়োজন হয় তার থেকে অনেক বেশি প্রযুক্তিবোধের প্রয়োজন হয় মোবাইল ব্যবহার করতে। বিগত দু' দশকে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে মোবাইলের ব্যবহার যেভাবে দেশময় ছড়িয়েছে তার দ্বারা একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতেই পারে যে নগদবিহীন অর্থনীতির ব্যবহারও আপামর জনসাধারণ ঠিকই করতে পারবেন, আর সাইবার অপরাধ অর্থাৎ ব্যবহারকালীন অসুবিধা? সেটুকু অসুবিধা নগদনির্ভর অর্থনীতিতেও ঘটে। টাকা গুণতে ভুল, পকেটমারি ইত্যাদি অনেক সমস্যা সেখানেও আছে। নগদনির্ভর অর্থনীতির মতো নগদবিহীন অর্থনীতিতেও একটু সচেতন হয়ে পদক্ষেপ করলে এই অপরাধগুলি এড়ানো যায়।

তফাৎ শুধু এক জায়গায়। নগদ অর্থনীতিতে অসতর্ক অবস্থায় খোয়া যাওয়া টাকা ফেরৎ পাওয়া কঠিন। টাকা গুনতে ভুল হলে আর ফেরত পাওয়া যায় না, পকেটমার হাতেনাতে ধরা না পড়লে সেই টাকাও ফেরত পাওয়া যায় না। নগদবিহীন অর্থনীতিতে কিন্তু প্রত্যেকটি সাইবার অপরাধের কিনারা হয়, কারণ অপরাধেরও সেখানে প্রমাণ থাকে অর্থাৎ অসতর্ক মানুষের খোওয়া যাওয়া অর্থ নগদবিহীন অর্থনীতিতে প্রতি ক্ষেত্রেই ফেরত পাওয়া যায়। উঠতে পারে খরচের প্রশ্নও, নগদবিহীন অর্থনীতিতে ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহের এককালীন খরচ (কার্ড সোয়াইপ মেশিন, পিওএস মেশিন বা অদূর ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হতে চলা বায়োমেট্রিক মেশিন ইত্যাদি) অর্থনীতিকে বাড়তি ভারাক্রান্ত করবে না তো? সে প্রসঙ্গে উল্লেখ্য নগদ অর্থনীতিতে নোট ছাপাতেও কিন্তু সরকারের প্রচুর খরচ হয়, নগদহীন ব্যবস্থার খরচ তার চাইতে বেশি হবে না।

এগুলি তো গেল, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও নগদবিহীন অর্থনীতিতে তার প্রতিকারের কথা। কিন্তু এর বাইরেও নগদবিহীন অর্থনীতি এক বড় সুফল প্রদান করে চলবে জাতীয় অর্থনীতিকে, যে সুবিধার সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়, তাহলো জালটাকার অভিশাপ থেকে জাতীয় অর্থনীতির চিরমুক্তি। কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো, সীমান্ত সন্ত্রাসে সাহায্য করা, চোরাচালান বৃদ্ধিতে সাহায্য করা ইত্যাদি যে সব সমস্যা জাল টাকার দ্বারা সৃষ্টি সেই সবগুলি সমস্যারই চিহ্নমাত্র থাকবে না নগদহীন অর্থনীতিতে। অর্থাৎ বলা যায়, নগদহীন অর্থনীতি এক হাতে কালো টাকা ও আরেক হাতে জাল টাকাকে রুখে দেবে।

উপরিউক্ত নগদনির্ভর দুর্নীতিগুলি ইতিমধ্যেই বড় ধাক্কা খেয়েছে বিমুদ্রীকরণের কারণে। কিন্তু নতুন মুদ্রাব্যবস্থাতেও কালো টাকা এবং জাল টাকার কারবারিরা নতুন করে দুর্নীতির চক্র খুলতে দেরি করবে না, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় তার প্রমাণ মিলেছে। তাই চিরতরে এই চক্রকে বন্ধ করতে বিমুদ্রীকরণের পরবর্তী এই পরিবর্তনশীল সময়েই যত শীঘ্র সম্ভব নগদবিহীন অর্থনীতি চালু করা উচিত। পুরোনো অভ্যাসের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণে মানুষ এই ব্যবস্থাকে হয়তো প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখবে কিন্তু নতুনকে বরণ করে নেওয়ার মানসিকতায় এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করলে দেশের এবং দেশবাসীর উপকারই হবে। ■

ক্যাশলেস ইকনমি সমস্যা বনাম সম্ভাবনা

দেবাশিস আইয়ার

পরীক্ষা চলছিল, তাই ক'দিন দেবুদার আড্ডায় যেতে পারেনি অর্ক। কিন্তু আজ যেতেই হবে। কাল অর্কর দাদার কলেজে একটা ডিবেট কম্পিটিশান আছে। বিষয়— 'ক্যাশলেস ইকনমি ভারতের জন্য

অপরিহার্য।' অর্কর দাদা বিষয়ের পক্ষে বলবে। আর তাই সে অর্ককে বলেছে, দেবুদার কাছ থেকে এবিষয়ে কিছু ইনফরমেশন নিতে। অর্ক ওর দাদাকে বলেছে, দ্যাখ, ওরকম ভাবে বললে দেবুদার কাছ থেকে তেমন কিছু পাবি না, বরং এই বিষয়ে দেবুদার সঙ্গে তর্ক কর। এবং যেহেতু তুই পক্ষে বলবি, তাই দেবুদার সঙ্গে তর্কে তুই বিপক্ষের হয়ে বলবি। তাতে দেবুদা তোকে যে যে পয়েন্ট দিয়ে কাটবে সেটাই কাল তুই তোর তর্কের সময় কাজে লাগাবি।

আচ্ছা দেবুদা, নোট বাতিলের পর থেকেই যে ক্যাশলেস ইকনমির কথা শোনা যাচ্ছে সেটা কি সত্যিই বাস্তবে সম্ভব! কোনোরকম গৌরচন্দ্রিকা না করে সোজাসুজি শুরু করল অর্ক। যাতে ওর দাদার তর্কে ঢুকতে সুবিধা হয়।

দেবুদার যেন উত্তর মুখে লেগেই ছিল। বলল, দ্যাখ, আগে আমাদের বুঝতে হবে ক্যাশলেস ইকনমি বনাম লেস ক্যাশ ইকনমির ব্যাপারটা। ক্যাশলেস ইকনমি হল আমাদের সেই পুরনো বিনিময় প্রথা বা বার্টার ইকনমি। আমরা তো ছোটবেলায় পড়েছি, আগে কীভাবে আমাদের জিনিসপত্রের আদান-প্রদান হোত। যে চাল উৎপাদন করত সে আনাজ উৎপাদকের কাছে গিয়ে চালের বদলে আনাজ নিত। কিন্তু পরে সমাজ যত জটিল হতে শুরু করল তত বিকিকিনির মাধ্যম হিসাবে মুদ্রা বা টাকার প্রয়োজন হলো। কিন্তু যা ছিল একসময় বিনিময়ের মাধ্যম তাই একটা সময় হয়ে উঠল সমস্ত অনর্থের মূল। টাকার কোনো রং নেই। তার আয় ও ব্যয়ের প্রকৃতির ওপর তার সাদা বা কালো রং ঠিক হয়। এই আয় ও ব্যয় যত হিসাবের মধ্যে থাকবে তত অর্থনীতির লাভ। আর যত এটা হিসাব বহির্ভূত হবে তত ব্ল্যাক ইকনমির রমরমা। যখনই লেনদেন ক্যাশে না হয়ে চেক বা কার্ডে হবে তখন তা সহজেই সনাক্ত করা যাবে। জানা যাবে আমাদের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা।

কিন্তু তা বলে ক্যাশলেস! অর্কর সহজ সরল জিজ্ঞাসা। আরে ভাই ক্যাশলেস কে বলেছে? সরকার কি একবারও ক্যাশলেস বলেছে? সরকার বারেবারে বলছে লেস ক্যাশ। অর্থাৎ যতটা পারা যায় ততটা নগদবিহীন লেনদেন করা। আসলে আমাদের রাজ্যের অধিকাংশ মিডিয়ারই অর্থসংস্থান হয় চিটফান্ড বা এইরকম কোনো হাওয়ালা- পথে আসা টাকায়। যা কিনা পুরো নগদের কারবার। আর এইজন্য এদের এত গাত্রদাহ। এরা মানুষকে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরছে না। সরকার যখন বলছে লেস ক্যাশের কথা, ওরা তখন ক্যাশলেস বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

সরকার যখন নোট বাতিলের কারণ হিসাবে ৫-৬টা পয়েন্ট তুলে ধরল, তখন এরা শুধুই প্রচার করল ব্ল্যাকমানির কথা। কিন্তু এর ফলে যে টেরর ফিনান্সিং-এর কোমর ভেঙে গেল, ফেক কারেন্সি বা জালনোটের চক্রের যে কোমর ভাঙলে সে বিষয়ে সবাই স্পিকটি নট। আসলে যে মিডিয়া কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীর মৃত্যুতে মরাকান্না কাঁদে এবং তাকে হিরো প্রজেক্ট করতে চায় তারা যে টেরর ফিনান্সিং নিয়ে চুপ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষকে বুঝতে হবে এদের জ্বালার জায়গাটা।

দেবুদা বলেই চলেছে। আমরা যারা শিক্ষিত তাদের বুঝতে হবে নগদহীন তথা কম নগদের অর্থনীতির সুবিধাগুলো। তারপর আম জনতাকে সেটাই বোঝাতে হবে। এবিষয়ে সরকারের তরফে কত সুন্দরভাবে কাগজে, টিভিতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে। এমনকী এর জন্য বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইটও খোলা হয়েছে। যেখানে নগদ ছাড়া লেনদেনের সুবিধা, উপায় সব বিস্তারিত বলা আছে। এরকম কয়েকটি সাইট হল—

http://digitalindia.gov.in/
http://cashlessindia.gov.in
http://digitaljagriti.in/
https://digidhan.mygov.in/

কিন্তু গরিব মানুষরা কী এতশত বুঝবে! তাদের কাছে কার্ড পেমেন্ট মানে এক উট্‌কো ঝামেলা। অর্কর দাদা এবার একটু ফোড়ন কাটল।

বরং উল্টো। যে লোকটা আগে মোবাইল চালাতে পারত না আজ তারাই তো স্মার্ট ফোন চালাচ্ছে। প্রয়োজনে তারা

শিখবে। আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যখন কম্পিউটার এসেছিল তখনও বামপন্থীরা এইরকম বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ের সাপেক্ষে আজ বোঝা যাচ্ছে যে ভারতের বাকি সব রাজ্য সেটাকে অ্যাডপ্ট করলেও পশ্চিমবঙ্গ না করায় কীভাবে আমাদের একটা জেনারেশন পিছিয়ে পড়েছে।

আজ ভারত লেসক্যাশের কথা ভাবতে পারে। কারণ বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট আমাদের দেশ এখন ইউথ শক্তিতে ভরপুর। ফলে দেশের নীতি নির্ধারকেরা তাদের অনুকূলেই সিস্টেমকে নতুনভাবে সাজাতে চান। ১৯৯০ থেকে ক্যাশলেস ইকনমির শুরু। ২০১০ থেকে রমরমা।

এর মূল সুবিধাগুলি হলো স্থান- কাল-পাত্র ভেদে যে কেউ যে কারও হয়ে পেমেন্ট করতে পারবে। ধরা যাক, আমি বেড়াতে গিয়ে মানিব্যাগ হারিয়ে ফেলেছি। এবার যেভাবেই হোক আমাকে ক্যাশ টাকার জোগান দিতে হবে। কিন্তু আমার যদি মোবাইলেই ওয়ালেট থাকে আমি সেটার মাধ্যমে তো এমারজেন্সি কেনাকাটা করতে পারি। আমি হাসপাতালে ভর্তি, আমার বাবা বাড়িতে বসেই হাসপাতালের বিল পেমেন্ট করতে পারবেন। এছাড়া ই-পেমেন্টকে উৎসাহ দিতে পেটিএম-এর মতো মোবাইল ওয়ালেট সংস্থাগুলো তো বিভিন্ন রকম রিওয়ার্ড পয়েন্ট ও ক্যাশব্যাক অফার দিচ্ছে। এছাড়া অনলাইন পেমেন্টে সরকার অনেক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে।

খালি একটা সমস্যা। ক্যাশলেস ইকনমিতে আইডেনটিটি প্রুফ অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য আধার-এর মতো বায়োমেট্রিক ডকুমেন্টকে রাখতে হবে। সরকারের তরফে আধারের মাধ্যমে গ্যাস বা অন্যান্য ডায়রেক্ট পেমেন্টের বিষয় রেখেছে। পাশাপাশি স্মার্ট সিটির মতো স্মার্ট ভিলেজের ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ এমন গ্রাম, যেখানে থাকবে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন, থাকবে টেলি মেডিসিন সার্ভিস, টেলি এডুকেশন সার্ভিস, স্কিল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস।

কিন্তু ভারতের সাইবার সিকিউরিটির যা অবস্থা তাতে হ্যাকিংয়ের ভালো সম্ভাবনা থাকছে। সেক্ষেত্রে গরিব, অর্ধশিক্ষিতরা কীভাবে একে ভরসা করবে! অর্কর দাদার দেবুদাকে মোক্ষম বাউন্সার।

দেবুদা যেন এবার একটু রেগেই গেল। কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বলল, আমাদের এটাই সমস্যা। ৬০ বছরের কাজের জবাবদিহি ২ বছরেই নেব। আরে ভাই, এত বড় বিপ্লব একটু সময় দিতে হবে না? এর মধ্যে কাজ শুরু হয়েও গেছে। উন্নত মানের নেট পরিষেবার জন্য উন্নতমানের পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। আর সিকিউরিটির জন্য বায়োমেট্রিক সিকিউরিটিকে কম্পালসারি করা হচ্ছে।

অর্থাৎ এবার শুধু অ্যাকাউন্ট হ্যাক করলেই হবে না, সঙ্গে আমার আঙুলের ছাপ ইত্যাদিও হ্যাক করতে হবে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে গেলে। ফলে অতটা চিন্তা না করলেও চলবে। এরপরও যদি কারও আকাট বুদ্ধির জন্য চুরি যায় তাহলে কী করা যাবে! সে তো এখনও কিছু মানুষের ক্যাশ টাকা ছিনতাই হচ্ছে। অন্তত তখন তো কত টাকা চুরি গেল সেটারও একটা হিসাব থাকবে। কর ফাঁকির জন্য কেউ আর আয়ব্যয়ে সহজে কারচুপি করতে পারবে না। আর সরকারের কোষাগার ঠিকঠাক ভরলে আমাদেরই পরিকাঠামো ও অন্যান্য উন্নয়ন সহজে হবে। ঋণজর্জর উন্নয়নশীল অর্থনীতি থেকে উন্নত অর্থনীতিতে পৌঁছবে। আর তার জন্য না হয় কিছুদিন কিছু কষ্ট সহ্যই করলাম। ক্ষুদিরাম, নেতাজী সুভাষের ত্যাগের কথা বলব, আর দেশের দরকারে নিজেদের পিঠ দেখাবো— এই দুটো তো একসঙ্গে চলতে পারে না।

আর একটা কথা জেনে রাখো, যে মানুষ স্বচ্ছ ভারতের সংকল্প নিয়েছেন তিনি সাইবার স্বচ্ছতা নিয়ে ভাববেন না তা কী হয়। ইতিমধ্যে তিনি এবিষয়ে একটি উদ্যোগও নিয়েছেন, ভালোভাবে জানার জন্য এই ওয়েবসাইটটা দেখে নিতে পারো—

http://www.cyberswachhtakendra.gov.in

যে প্রধানমন্ত্রী সারা দিনে নিজের বিশ্রাম নিয়ে ভাবেন না, তাঁর ওপর বিশ্বাস না রাখলে আর কার ওপর বিশ্বাস রাখা যাবে, সবার একটু ভেবে দেখা উচিত।

অর্করা এবার সত্যিই স্পিকটি নট। বুঝে গেল, কাল তর্কর জন্য যথেষ্ট পয়েন্ট জোগাড় হয়ে গেছে দাদার। আর বসে কাজ নেই। কাল আবার প্র্যাকটিক্যালের জন্য তৈরি হতে হবে যে!

■

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রণীত
সদ্য প্রকাশিত বই

মুসলমান সমাজে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ এবং তার ভয়াবহ পরিণাম

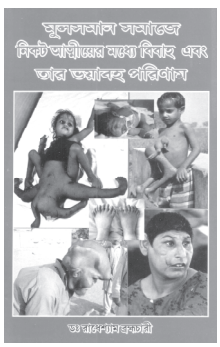

—: প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান :—
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩

মূল্য ২০ টাকা মাত্র

ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন কীভাবে করবেন

সন্দীপ চক্রবর্তী

ডিজিটাল অর্থনীতিতে পেমেন্ট যিনি করবেন এবং যিনি নেবেন দু'জনকেই ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ পেমেন্ট হবে অনলাইনে। নগদ টাকা কোনোভাবেই ব্যবহার করা চলবে না। এই নিবন্ধে আমরা ডিজিটাল লেনদেনের পদ্ধতিগুলো একটু দেখে নেব।

ডিজিটাল লেনদেনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার আমরা অনেকেই করে থাকি। এখন আমরা ইউপিআই প্রযুক্তিতে পৌঁছে গেছি। এছাড়া রয়েছে আরও অনেক প্রযুক্তি যা নগদহীন বা কম নগদের অর্থনীতিকে নিশ্চিত ভাবে পুষ্ট করবে।

ইউ পি আই অ্যাপ

ইউ পি আই-এর অর্থ ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস। এই পদ্ধতিতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করা যায়। শর্ত একটাই, যে-দুটি অ্যাকাউন্টের মধ্যে লেনদেন হবে সেই দুই গ্রাহকের ফোনে এই অ্যাপ থাকতে হবে। অ্যাকাউন্টে মোবাইল ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা থাকলেই এই অ্যাপ ব্যবহার করা চলে। প্রয়োজন শুধু একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনের। ইউপিআই শ্রেণীভুক্ত অ্যাপের মধ্যে রয়েছে ভীম, এসবিআই ইউপিআই অ্যাপ, আই মোবাইল ফোন পিই অ্যাপ ইত্যাদি।

এ ই পি এস

এ ই পি এস-এর অর্থ আধার ইনেবেল্ড পেমেন্ট সার্ভিস। বোঝা যাচ্ছে আধার কার্ড থাকলেই এই পদ্ধতিতে লেনদেন করা যায়। এ ই পি এস-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কে টাকা ট্রান্সফারের সুবিধে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে পরিমাণ টাকা আপনি ট্রান্সফার করতে চান, ব্যাঙ্ক তা আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নিয়ে যাকে দিতে চান তার অ্যাকাউন্টে জমা করে দেবে। অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত রেকর্ডে আধার কার্ড নম্বর নথিভুক্ত করলেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিতে লেনদেন করলে কোনো ট্রানজাকশন ফি লাগে না। আপনি টাকা তুলতে বা জমা দিতেও পারবেন। এই পদ্ধতির সব থেকে বড়ো সুবিধা হলো এতে আপনার সই লাগে না, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য বা কোনো

পাসওয়ার্ডও লাগে না। আপনার আঙুলের ছাপই এর পাসওয়ার্ড। আঙুলের ছাপ যেহেতু নকল করা যায় না, তাই বলা যেতে পারে এই পদ্ধতি সব থেকে নিরাপদ।

ইউএসএসডি

ইউএসএসডি ব্যাঙ্কিংকে এক কথায় *৯৯# ব্যাঙ্কিং-ও বলা চলে। এর সুবিধা হলো এতে স্মার্ট ফোন বা ইন্টারনেট কানেকশন লাগে না। যে কোনো মোবাইল ফোনেই এই সুবিধা মেলে। *৯৯# কোড আপনার টেলিকম অপারেটারের সার্ভার এবং ব্যাঙ্কের সার্ভারের মধ্যে সেতুর কাজ করে। যে ফোনের মাধ্যমে আপনি লেনদেন করতে চান তার নম্বরটি শুধু আপনাকে ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত করতে হবে। তারপর *৯৯# ডায়াল করলেই আপনি এই সুবিধে পাবেন। এই পদ্ধতিতে আপনি প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেন করতে পারবেন। লেনদেন পিছু আড়াই টাকা করে আরবিআই ট্রানজাকশন ফি নেবে।

ক্রেডিট কার্ড

ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহকদের ক্রেডিট কার্ড দেয়। এই কার্ডে আপনি যেমন টাকা তুলতে পারেন ঠিক তেমন দেশ-বিদেশের যে-কোনো দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে পারেন।

ডেবিট কার্ড

অ্যাকাউন্ট থাকলেই ব্যাঙ্ক আপনাকে ডেবিট কার্ড দিতে পারে। আপনার অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা খরচ করার জন্য আপনি ডেবিট কার্ড ব্যবহার করতে পারেন। যে টাকা আপনি পেমেন্ট করলেন, তা আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নিয়ে, যাকে দিতে চান তার অ্যাকাউন্টে ব্যাঙ্ক জমা করে দেবে।

প্রিপেইড কার্ড

ফোনের প্রিপেইড সিমের ক্ষেত্রে আমরা যেমন আগে টাকা দিই, পরে খরচ করি প্রিপেইড ডিজিটাল পেমেন্ট কার্ডও তাই। এই পদ্ধতিতে আগে প্রিপেইড অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করতে হয় এবং টাকার পরিমাণ কমে গেলে বা অ্যাকাউন্ট শূন্য হয়ে গেলে রিচার্জ করতে হয়।

ই-ওয়ালেট

ই-ওয়ালেট হলো আপনার প্যান্টের পকেটে থাকা চামড়ার ওয়ালেটটির ডিজিটাল রূপ। আপনি ই-ওয়ালেটে টাকা রাখতে পারেন, ইচ্ছামতো খরচও করতে পারেন। মোবাইল রিচার্জ করুন, যে-কোনো জায়গা থেকে বন্ধুকে টাকা পাঠান। কোনো বাধা নেই। একটা স্মার্ট ফোন আর ইন্টারনেট কানেকশন থাকলেই হলো। ভারতে জনপ্রিয় ই-ওয়ালেটগুলি হলো : স্টেট ব্যাঙ্ক বাডি, আই সি আই সি আই পকেট, ফ্রিচার্জ, পেটিএম ইত্যাদি।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেনের মাধ্যম এখনও পর্যন্ত এইগুলোই। পরে আরও নতুন প্রযুক্তি আসবে। সুযোগ পেলে তাই নিয়ে পরে কখনও আবার লেখা যাবে। ■

চিঠিপত্র

ডিএ নাকি দয়ার দান

স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদের ডিএ সংক্রান্ত মামলাটি স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল খারিজ করে রায় দিয়েছে ডিএ প্রদান সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। 'সরকারের দয়ার দান'। 'দান' শব্দটির অর্থ ব্যাপক ও বহুধর্মী। 'দান' সাধারণত ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রগত হয়ে থাকে। দানের ক্ষেত্রে দাবি থাকে না। স্বত্ব বিনিময় বা প্রত্যাশা না রেখে প্রদানই— 'দান'। 'ডিএ' কোন্ ধরনের দান— ট্রাইবুনালের বিচারক এ. কে. চন্দ্র এবং অমিত তালুকদারের কাছে জানতে ইচ্ছা করে। ডি-এর অর্থ মহার্ঘভাতা। চাকরি সুনিশ্চিত হলেই কর্মচারীরা মহার্ঘভাতা পাওয়ার অধিকারী। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সাজুয্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের অর্থনৈতিক ব্যয়ভারের সমতায় মহার্ঘভাতা ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত মহার্ঘভাতা সমহারে সমস্ত রাজ্য (তৎক্ষণাৎ সবটা না হলেও) কর্মচারীদের দিয়ে থাকে। মহার্ঘভাতা পেলে মোট বেতনের বৃদ্ধি ঘটে এবং বরাবর তা পাওয়া যায়। 'দান' হলে একবার পাবে, ধারাবাহিকতা বজায় থাকে কি? 'দান' শব্দটি সরকারের মুখপাত্র স্বরূপ ট্রাইব্যুনালের ডিএ না দেওয়ার কৌশলী শব্দ প্রয়োগ। ডিএ না দেওয়ার অর্থ বঞ্চনা। ন্যায্য পাওনা না পেলে দাবি ওঠে, হকের পাওনা পেতে মিটিং-মিছিল, আন্দোলন, পরিশেষে কর্মচারীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়। সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকার হাইকোর্টের রায়ে ডিএ দিতে বাধ্য হয়েছে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কর্মরত (কর্ণাটক-চেন্নাই-মহারাষ্ট্র) কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার পুরোটাই রাজ্য সরকার তাঁদের মিটিয়ে দিচ্ছে কীভাবে? সততার প্রতীক, গণতন্ত্রের পূজারিণী মুখ্যমন্ত্রীর এহেন দ্বি-চারিতা বা স্ববিরোধিতা কেন? কখনও শোনা যায় আগের সরকারের ঋণের বোঝার কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ডিএ দিতে পারছে না। প্রশ্ন জাগে, ক্ষমতায় বসার আগে ক্ষমতাসীন দল ও তার সর্বাধিকারিণী কি রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি জানতেন না? রাজ্য সরকারি হিসাব অনুযায়ী এক শতাংশ মহার্ঘভাতা বাবদ মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ ২৬ কোটি টাকা, বা বছরে ২৬×১২=৩১২ কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। বিপরীত দিকে মেলা, উৎসব, খেতাব বিতরণ, পারিষদ বর্গ-সহ জেলা সফর, দলের পছন্দের ক্লাবগুলিকে টাকা বিলানোর মাধ্যমে কুড়িয়ে পাওয়া হাততালির আড়ালে বঞ্চিতদের দীর্ঘশ্বাস জমছে। ঔদাসীন্য আর বঞ্চনার শিকার মানুষের ক্ষোভ অ্যাটমবোমের থেকেও মারাত্মক।

অশোক কুমার মণ্ডল,
উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

কোরআন বলেনি

'ইসলামের দফারফা' শীর্ষক পত্রে (স্বস্তিকা, ২৮.১১.১৬), মৃণাল হোড় বলেছেন--- বাইবেলে বলা হয়েছে আব্রাহাম, উরফ ইব্রাহিম নবি স্বপ্নাদেশ পেয়ে সারা বিবির গর্ভজাত পুত্র ইসহাককে কোরবানি দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অথচ কোরআনের মতে, ইব্রাহিম স্বপ্নাদেশ পেয়ে দাসীপত্নী হাজেরার গর্ভজাত পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। মৃণালবাবুর বক্তব্যে কিছু গলতি আছে। কোরআন বলেনি, ইব্রাহিম ইসমাইলকে কোরবানি দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন; এবং বলেনি যে, হাজেরা ইব্রাহিমের দাসীপত্নী। সমগ্র কোরআনে হাজেরার কোনো উল্লেখ নেই। কোরবানি প্রসঙ্গে কোরআনে, (সুরা : সাফ্‌ফাত; আয়াত ১০০-১০২), বলা হয়েছে--- ইব্রাহিম তাঁর 'প্রতিপালকের' কাছে সৎকর্মপরায়ণ এক পুত্রসন্তান প্রার্থনা করেন এবং এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রলাভ করেন। সেই পুত্রের যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়স হয় তখন ইব্রাহিম স্বপ্নাদেশ পেয়ে সেই পুত্রকে জবাই করতে নিয়ে গিয়েছিলেন--- ['কোরআন শরিফ'--- (অনুবাদ) মাওলানা মোবারক করিম জওহর]। অর্থাৎ, আল্লার দোয়ায় ইব্রাহিম যে পুত্রলাভ করেছিলেন, সেই পুত্রকেই তিনি কোরবানি দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সারার গর্ভজাত সেই পুত্রের নাম আইজাক (আরবি, ইসহাক)। বাইবেলেও তাই বলা হয়েছে। 'কোরবানি' কাহিনিতে বাইবেল ও কোরানে কোনো পার্থক্য নেই। জিহোভার বরে আব্রাহাম যে পুত্রলাভ করেছিলেন সেই পুত্র আইজ্যাককে তিনি কোরবানি দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, সেমেটিক সাহিত্যের অধ্যাপক ফিলিফ কে. হিট্টি 'হিস্ট্রি অব দি আরবস' গ্রন্থে বলেছেন, হাদিসে বর্ণিত আছে যে ইব্রাহিম মোরিয়া পাহাড়ে পুত্র ইসহাসকে কোরবানি দিতে চেয়েছিলেন। মৃণালবাবু হাজেরাকে (বাইবেলে, Hagar) আব্রাহামের দাসীপত্নী বলে উল্লেখ করেছেন। ঘটনা হলো, হাজেরা ছিল সারার মিশরীয় ক্রীতদাসী। নিজেকে সন্তান ধারণে অক্ষম ভেবে সারা একসময় আব্রাহামকে অনুরোধ করেছিল হাজেরাকে শয্যাসঙ্গিনী করতে (''Why don't you sleep with my slave-girl ? Perhaps she can bere a child for me'')। আব্রাহাম রাজি হয়; ইসমাইলের জন্ম হয়। এরমধ্যে একসময় হাজেরার চালচলনে বিরক্ত হয়ে সারা অনুযোগ করলে আব্রাহাম সারাকে বলেছিলেন— ''She (Hagar) is your slave and under your control : do whatever you want with her"– (Genesis : 16)। কাজেই, আব্রাহামের সন্তানের জননী হলেও হাজেরাকে আব্রাহামের পত্নী দূরে থাক, উপপত্নীও বলা যায় না। পরিশেষে একটা কথা। মৃণালবাবু লেখাটি শুরু করেছেন 'হায় হাসিনা হায়!' বলে এবং শেষ করেছেন 'কুরান ও ইসলামের দফারফা শেষ নবি স্বয়ং করেছেন, আমি নয়' বলে। কথাটির তাৎপর্য বুঝা দুষ্কর। লেখাটির মাঝখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করে অনেক কটুকাটব্য করা হয়েছে। কোরআনে কী বলা হয়েছে না হয়েছে তার জন্য শেখ হাসিনাকে গালমন্দ দেওয়া হবে কেন?

—**বিমলেন্দু ঘোষ,** কলকাতা-৬০।

‘নোটবন্দি’ ইস্যু

জয়দীপ রায়

জাতীয় রাজনীতিতে মিইয়ে যাওয়া ‘নোটবন্দি’ ইস্যু থেকে কিছুতেই আর বেরিয়ে আসতে পারছেন না তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়মমাফিক তার জের চলতি বিধানসভাতেও বাদ যায়নি। নোটবন্দির ক্ষেত্রে এ ক’মাসে আম জনতার কোনো হেলদোল না থাকায় মমতার আন্দোলন ক্রমাগতই ফিকে হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এর মাঝেই আরবিআই ব্যাঙ্ক লেন-দেনের ক্ষেত্রে যেসব বিধিনিষেধ ছিল তাও তুলে নিয়েছে। ফলে, যে ভাবে তিনি গর্জে উঠেছিলেন সেই ভাবে রাজ্যের মানুষের মনে বর্ষাতে পারেননি। কারণ, সাধারণ মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার, ‘নোটবন্দি’ ইস্যু জনস্বার্থের দিকে তাকিয়ে কোনো আন্দোলন নয়। বরং বিমুদ্রীকরণকে সামনে রেখে গরিব মানুষের কোটি কোটি টাকা নয়-ছয় করে আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত গুটিকয়েক দলীয় নেতা-সাংসদদের আইনি জটিলতা থেকে মুক্ত করাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

গত তিন-চার মাস ধরে অসার উদ্দেশ্যহীন একটা আন্দোলন যেভাবে তিনি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, তা রাজ্যের মানুষ পরতে-পরতে বুঝতে পারছে। ট্রামে-বাসে অথবা পাড়ার চায়ের দোকানের চর্চায় কান পাতলেই সেটা বোঝা যায়। আরও বোঝা যায়, উদ্দেশ্যহীন আন্দোলনের খামখেয়ালিপনায়। নোটবন্দি বিরোধিতায় প্রথমে তৃণমূল নেত্রীর ইস্যু ছিল ব্যাঙ্কে টাকা লেন-দেনের ক্ষেত্রে ‘সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ’ নিয়ে। মুখে সাধারণ মানুষের কথা বললেও পর্দার আড়ালে ছিল জাতীয় রাজনীতিতে জোট-ঘোট করে নেতৃত্ব দেওয়ার এক সুপ্ত বাসনা। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, রাজনৈতিক গতি প্রকৃতির ‘পারমুটেশন-কম্বিনেশন’ করে হালে পানি পাচ্ছেন না, তখন তিনি নোটবন্দির সঙ্গে যোগ করলেন ‘প্রতিহিংসার’ রাজনীতি। কারণ তার দলের সাংসদরা আর্থিক তছরুপের দায়ে জেলবন্দি হয়েছেন। এরকম একটা ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে দিদির জঙ্গি আন্দোলনের ফলে সাধারণ মানুষ যে অতিশয় বিরক্ত তা মানুষের কথাতেই উঠে আসছে। আর এটা বুঝতে পেরে তাঁর নতুন সংযোজন ‘সারদা’। তিনি নাকি এখন দলকে সারদা-বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপাতে বলছেন। যদিও সেই আন্দোলন এখনও দানা বেধে ওঠেনি। বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলছেন, দানা বাঁধবে কীভাবে, তাহলে তো নিজেদের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করতে হয়। সম্প্রতি রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে যেভাবে অশান্তি তুসের আগুনের মতো ছড়াতে শুরু করেছে, এভাবে চলতে থাকলে সেদিন বেশি দূরে নেই, যখন এই আগুন ‘লেলিহান শিখায়’ পরিণত হবে। একদিকে শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাঁধনহীন শাসকদলের গুণ্ডামি। তার জেরে পঠন-পাঠনের মধ্যে অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে মালদা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূল মদতপুষ্ট জমি-মাফিয়াদের তাণ্ডবে অতিষ্ট নাগরিক জনজীবন। সম্প্রতি ধুলাগড় ও তেহট্টে ঘটে যাওয়া মৌলবাদী অত্যাচারের ঘটনা যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে অচিরেই জেহাদি শক্তি সমাজব্যবস্থাকে গ্রাস করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শিক্ষামহলের একাংশ। অথচ আশ্চর্যজনক ভাবে এত কিছুর পরেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কোনো হেলদোল নেই। বরং তোষণ রাজনীতি করে কিছু ভোটের লোভে ধুলাগড়ের ঘটনায় তৃণমূল নেত্রী ‘কিছুই হয়নি’ বলে মন্তব্য করে দায় সেরেছেন। উল্টে যে সংবাদমাধ্যম প্রকৃত সত্যকে উন্মোচিত করে জনসমক্ষে আসল ঘটনা তুলে ধরেছে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে মমতা সরকারের অপদার্থ পুলিশ।

যে সরস্বতী পুজোকে সামনে রেখে মমতা ব্যানার্জী কেন্দ্রের বাজেটের বিরোধিতা করেছেন, বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে তোষণ করতে গিয়ে সেই বাগদেবীর পূজাই রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় করতে দেওয়া হয়নি। এমনকী মৌলবাদীদের কাছে মাথা নত করে তেহট্টের একটি স্কুলের পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে। প্রথা মেনে স্কুলের বাইরে পুজো করতে চাইলে পুলিশের ডাণ্ডায় মাথা ফেটেছে এক নিরীহ স্কুল ছাত্রীর। অন্যদিকে, ধুলাগড়ের হিংসাত্মক ঘটনায় যাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর করে, অত্যাচার চালিয়ে শ্লীলতাহানি করা হলো, সেই পীড়িতদের বেশির ভাগই তৃণমূল সমর্থক। তারা দিদিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছিল। অথচ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির কাছে মাথা নীচু করে এই অত্যাচারিত মানুষগুলোর জন্য নূন্যতম সুরক্ষার ব্যবস্থা করেনি রাজ্য প্রশাসন। রাজ্য বিজেপির এক সদস্যের শ্লেষ, যে রাজ্যে একজন ইমাম শাসকদলের এমপিকে পাশে বসিয়ে, দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করে ফতোয়া জারি করতে পারে, যে ফতেয়ার বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই একাংশ, সেখানে ভোট হারাবার ভয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার! তিনি যে জেহাদি মৌলবাদীদের সঙ্গে আছেন সেটা বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তৃণমূল নেত্রী রাজ্যের হিন্দু তথা বাংলার মানুষের সহনশীলতার সুযোগ নিয়ে যে তোষামোদের রাজনীতি শুরু করেছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ অথবা মিনি পাকিস্তানে রূপান্তরিত হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ■

প্রাণের ঠাকুর সীতারাম

সারদা সরকার

'একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে
পরম-এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে।
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষশত ভক্তচিত বাক্যহারা
বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।'

সেই রাজরাজেন্দ্র, নামাবতার শ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ। যাঁকে ভালোবেসে লক্ষ লক্ষ মানুষ পেয়েছে জীবনে চলার পথের সন্ধান। তাঁর জন্মমাস চলছে এখন। ভক্তজনের কাছে ফাল্গুনের কৃষ্ণাপঞ্চমীর দিনটি থেকে শুরু করে সারা মধুমাসই ওঙ্কারদিবস, ওঙ্কারপক্ষ, এমনকী ওঙ্কারমাসও বটে। এই সামান্য স্মৃতিচারণ এক মহাজীবনকে ছুঁয়ে দেখার এক অসহায় প্রচেষ্টা। বড় মধুর এই ফিরে দেখা— 'মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্'!

দীন বেশ, দীর্ঘ জটা, বুকে গুরুপাদুকা, পরনে ডোর কৌপীন, বহির্বাস, খালি পা, হাতে ওঙ্কারদণ্ড। শীর্ণ শরীর যেন সব রকম ভোগবাদের মূর্ত প্রতিবাদ। এতোটুকু মেদ শরীরে কোথাও নেই। অথচ এই শরীরে কী অমানুষিক শক্তিই না সঞ্চিত। আহার একরকম নেই বললেই হয়। তুলসীপাতার রস ছাড়া সেরকম কিছুই আনন্দ করে খান না। আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ফলপ্রসাদের থালা কিংবা অন্নভোগের সময় মুখে কিছুই তোলেন না। অথচ রোজ হাজার হাজার ভক্তকে নিজে তদবির করে খাওয়ান। খাওয়ানোর জন্য যে ব্যস্ততা তা ঠিক মায়ের মতো। পংক্তির মাঝে মাঝে চলেন প্রসাদ গ্রহণ দেখতে। জনে জনে জিজ্ঞেস করেন, পেট ভরেছে বাবা? কেউ অভুক্ত থাকলে তিনি কষ্ট পান। তিনি ক্ষুধাহরণ, অন্নচিন্তা চমৎকারা, অন্নগত প্রাণ, সাধারণ জীব আমরা, তাই অন্নদান ব্রত তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত।

ক্ষুধা যে শুধু অন্নের তা তো নয়। তিনি জগদ্‌গুরু। জগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ। কল্পবৃক্ষের মতো, না চাইতেই দেন। অযাচিতভাবে কৃপা বর্ষণ করেন। তিনি বলেন, নতুন কিছু হচ্ছে না, সব হয়ে আছে, আনন্দ কর। যতক্ষণ আমি দেহ— এই বোধ, ততক্ষণ দুঃখভোগ। দেহটি তাঁর হয়ে গেলেই আনন্দ।

তিনি উদাত্তকণ্ঠে বার বার ঘোষণা করেছেন, 'তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহত্রয় নও, তুমি শ্রীভগবানের অংশ। তুমি নিত্য মুক্ত, স্বত শুদ্ধ। তুমি কি চাও জানো? তুমি আমার 'আমি'-কে চাও। শ্রী ভগবানকে চাও। তুমি দেহ ধারণ করেছ ঈশ্বর দর্শনের জন্য। মানুষ জগতে আসে ঈশ্বর লাভের জন্য।'

ঈশ্বর লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় নামসঙ্কীর্তন! ভারত জুড়ে চলে তাঁর নামপ্রচারের কর্মকাণ্ড। হিমাচলের শৃঙ্গশিখর চাক্রাতায়, উত্তরকাশীতে, হৃষীকেশে, ভেটদ্বারকায়, পুরীর সমুদ্রসৈকতে, মাদ্রাজে, রাজামাহেন্দ্রীতে, গোদাবরী তীরে, শ্রীরঙ্গমে, রামেশ্বরে, ওঙ্কারেশ্বরে, কন্যাকুমারিকায়, কুরুক্ষেত্রে, মেহসানায়, পুষ্করে কত তীর্থে, কত জনপদে সীতারাম বিছিয়ে চলেছিলেন তাঁর কর্মের বিস্তার। সীতারামের প্রাণ করুণায় ভরা। যাকে যেভাবে পারেন, তাকে সেভাবে সাহায্য করতে ঠাকুর সবসময় প্রস্তুত। ধনী-মানী, কাঙাল, গরীব, উপেক্ষিত দীনদুঃখীর জন্যেই তিনি ধরায় এসেছেন। গোপালপুরে চাতুর্মাস্য চলছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি হাজার হাজার নরনারীর যাতায়াত। ঠাকুর যেন ব্যথাহারী। তাদের কার কখন কী দরকার সেই কাজে তৎপর। একদিন লক্ষ্য পড়ল, জীর্ণ মলিন কাপড় পরে এক বিবাহিত মেয়ে এসেছে তার মায়ের সঙ্গে, কোলে অতিময়লা শতছিন্ন কাপড়ে জড়ানো একটি শিশু। অসীম স্নেহে ঠাকুর তাকে কোলে তুলে নিলেন, শিষ্যদের মধ্যে কে চিকিৎসক তার খোঁজ পড়ল, রোগের মূল কারণ যে অভাব, অর্থানুকূল্যের ব্যবস্থাও ঠাকুর করে দিলেন।

আশ্রিত শিষ্য হাওড়ার শ্রী শ্যামল বসুর কাছে শোনা আরেকটি ঘটনা। কাশীতে গঙ্গাবক্ষে ঠাকুরের তখন নিভৃত বিশ্রাম বজরায় রোগমুক্তির প্রয়াসে। মাত্র ছ'জন শিষ্য সঙ্গে রয়েছেন। দিনের মধ্যে একবার মাত্র বজরা তীরে আসে স্বল্প নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী নিতে, সেই সময় গঙ্গার ঘাটে ভক্তদের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, বাকি সময়ে সুরেশ্বরী গঙ্গার বুকে গঙ্গাপ্রেমী ঠাকুরের অবস্থান-লোকসঙ্গবিবর্জিত। হাওড়ার শ্যামল বসু তখন ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী। কাগজপত্র সেবকের। রোজ শত শত চিঠি পড়ে তার মধ্যে থেকে কিছু বাছাই করে ঠাকুরকে খবর দেওয়াই তার কাজ। সেদিন মাত্র চার পাঁচ খানা চিঠিই নিয়ে সে হাজির

ঠাকুরের কাছে।

'হ্যাঁরে শ্যামল, আজকে মাত্র এই কটা চিঠি এসেছে, এত বাবাদের মায়েদের চিঠি আসে যে?'

'হ্যাঁ এসেছে বাবা প্রচুর চিঠি এসেছে! কিন্তু ওই যে সব চিঠি আমি মা গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছি!'

'সেকিরে! কেন?'

'বাবা, সব চিঠিতে শুধু দাও দাও দাও! কার মেয়ের বিয়ে, কার ঘর ভেঙে গেছে, কার ছেলের চাকরির প্রার্থনা! বাবা, এই নিভৃত নিবাসে আপনাকে আর সব চাহিদাপূর্ণ চিঠি দিয়ে জ্বালাতন করতে চাইনি। কারুর কোনো আধ্যাত্মিক চাহিদাই নেই! যে কটা পেয়েছি আপনাকে নিবেদন করেছি'।

'সেকিরে বাবা সব ফেলে দিলি'? কাতর প্রশ্ন ঠাকুরের!

নিজের দিকে দেখিয়ে ঠাকুর বলেন— 'দেখ বাবা, কত জ্বালা যন্ত্রণা নিয়ে এরা এটাকে চিঠি লেখে, তার থেকে যতটুকু পারা যায়— ভগবান তার ব্যবস্থা করেন— সেই অনুপ্রেরণায় এরা যদি একটু ভগবদ্‌মুখী হয়, একটু শাস্ত্রমুখী জীবনযাপন করে'।

এই ছিলেন সীতারাম যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, যারা বেদ উপনিষদ বুঝতে পারে না— ঈশ্বরলাভ করতে কঠিন কোনো গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তাদের বুঝে ওঠার প্রয়োজন নেই! আর কিছু পারো না পারো হরিনাম তো করতে পারবে। দীক্ষাদান না বলে বলা ভালো আশ্রয় দান। সেই আশ্রয়দানের দক্ষিণা ছিল ফলের বদলে একটি হরিতকী, বস্ত্রের বদলে একটি খণ্ড উপবীত আর চার লক্ষ রামনাম লেখার প্রতিশ্রুতি। রামনাম না লিখলে দীক্ষা সম্পূর্ণ হয় না যে! তাই গুরুদক্ষিণার চার লক্ষ রামনাম লিখতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে গুরুমুখী হতেই হয়— তাতেই যে দীনদুখী মানুষ ভুলে থাকে সংসার জ্বালা! আচণ্ডাল নাম বিতরণের সঙ্গে বিলিয়েছেন একটু ধর্মবোধ, একটু ভগবৎমুখী হবার দীক্ষা! সারাজীবন হাজার মানুষকে অন্নদান— ধনী নির্ধন শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান নির্বিশেষে অকাতরে অন্নদান যজ্ঞ চলেছে দশকের পর দশক ধরে।

কন্যাকুমারিকার আশ্রমে থাকাকালীন ঠাকুরের স্বহস্তে লেখা চিঠি— 'বাবা শ্যামল, তোরা কেমন আছিস? তোরা মা'র করুণাধারায় স্নাত হবি। তুই কি পাঁচ হাজার টাকা 'এটা'কে গত শীতে পাঠিয়েছিলি? সে টাকা হজম হয়ে গেছে— আবার না পাঠালে খিদেয় পেট জ্বলে যায় যে!' কয়েক দশক পেরিয়ে গেছে, সে চিঠি হাতে আজ মৃত্যুপথযাত্রী ভক্তের চোখে জল!

প্রিয়শিষ্য কিঙ্কর অভয়ানন্দের কবিতায় তাঁর স্মৃতিচারণ— 'মনে পড়বে তোমার কঠোর টাকাপয়সার হিসাব— উদার নির্ভীক অর্থব্যয়— দানের বন্যা— আতিথেয়তার মহোৎসব, কর্মচাঞ্চল্যের ঝঞ্ঝা, দয়ার বৃষ্টি, সদাচারনিষ্ঠার খররৌদ্র। তোমার পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংসারিকতার সযত্নরচিত উদ্যানে নিরাসক্তির নিঃসীম মরুপ্রান্তর! হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কাপড় নামাবলী শাল কম্বল নির্বিচারে বিলিয়ে দেওয়া!'

কঠোরতা ও তপস্যার কথা না বললে সীতারামকথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পাদুকা, ছাতা, মশারি, বালিশ কিছুই ব্যবহার করেন না। তাই বলে গৃহী ভক্তের দুঃখদুর্দশার কথা বুঝতে পারেন না তা একেবারেই নয়। তিনি সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর ভিড়ের মধ্যেই যাতায়াত করতে ভালোবাসেন। নামপ্রচারের কাছে তাতে সুবিধেই হয়। ঠাকুর বলতেন যে সর্বদা নাম করে সে জীবন্মুক্ত। বৈদ্যুতিক পাখা তো দূরের কথা হাতপাখার হাওয়ার প্রত্যাশী ছিলেন না এই যোগী। শুধু ঠাকুরের চারপাশে নামকীর্তনের শব্দতরঙ্গ ঝঙ্কার তুলছে বায়ুমণ্ডলে। অষ্টপ্রহর নামে ভরে থাকে সীতারাম আশ্রম এবং আশ্রমিকেরা। হরিনাম এখানে হয়ে উঠেছে সুরসাধনা— সরস্বতীর আসন যেন। রাতভর একে একে নাম হয় শিবরঞ্জনী, সাহানা, বেহাগ, বাগেশ্রী সুরে— সেই সুর ধীরে ঢলে পড়ে ললিতে। মানসগঙ্গায় অবগাহন করে সুষুপ্তি থেকে উঠে আসা মৃদুকণ্ঠ সীতারামের! 'মাতর্গঙ্গে!' এই শব্দবন্ধের ওপর ঠাকুরের এক অমোঘ আকর্ষণ ছিল। কথায় স্বগতোক্তি করতেন মাতর্গঙ্গে! জন্মস্থান হুগলী জেলার ক্যাওটার পাশ দিয়ে বয়ে গেছেয় স্নিগ্ধসলিলা জাহ্নবী— ডুমুরদহে পৈত্রিক ভিটা সেও তো গঙ্গার কূলে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যত আশ্রম গড়ে উঠেছে, তার বেশিরভাগই গঙ্গার তীরে। ত্যাগী যোগক্লিষ্ট জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসীর গঙ্গা আরাধনা প্রাত্যহিক প্রার্থনা ছিল। 'সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা, গঙ্গৈব পরমাগতি'। সুধার ধারা কাব্যগ্রন্থে কবি ওঙ্কারনাথ লিখেছেন ''গঙ্গা যাঁর পাদপদ্মে লভিলা জনম/জপরে তাঁহার নাম তুমি অনুক্ষণ/দেখ গঙ্গা জপ নাম রাম রাম/হইবে জীবন ধন্য দাস সীতরাম"। 'হে দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে'— আজ তো তোমারও মহাভাগ্য হে জাহ্নবী। বৈষ্ণব দাসানুদাস সীতারাম স্বয়ং তোমার সামনে প্রণত— হে গঙ্গা শুদ্ধ হও! ভক্তবৃন্দ গঙ্গাদর্শন করে ঠাকুরের সঙ্গে। নাম-সঙ্কীর্তন আরো জমে ওঠে, সূর্যোদয় হয় দিগন্ত জুড়ে। হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ কলৌনাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা। কলিযুগে নামসঙ্কীর্তন ভিন্ন পথ নেই। প্রচার সুর অথবা জয়দেব এ সুরঝঙ্কার বেজে ওঠে! হে কলিহত জীব— নামের পরশপাথরের ছোঁয়া লেগেছে তোমার গায়ে। সীতরামের কাছে এসে পড়েছ যে! সীতরাম তাঁর ভক্তকে ঘিরে তাই আজও দাঁড়িয়ে রয়েছেন একই ভাবে— 'ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি এক পাও ছেড়ে যাওনি— আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি'।

(লেখিকা লন্ডন প্রবাসী)

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

ফ্রেডরিক শ্লেজেল : (১৭৭২-১৮২৯)

পরিচিতি : ইনি জার্মানির অন্যতম দার্শনিক, লেখক, সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী ও জার্মান রোমান্টিজম'-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই সর্বপ্রথম ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক। তাঁর লেখা বিখ্যাত পুস্তক, 'অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড উইসডম অফ্ দ্য ইন্ডিয়ান্স' যা পরবর্তীকালে বহু ভাষাবিদের যেমন ফ্রাঞ্জ বোপ, অগাস্ট শ্লোজাল, ম্যাক্সমুলার, মাইকেল ব্রেল, ব্লুমফিল্ড লিওনার্ড, রোমান জেকব্সন এবং ফ্রিট্স স্টলের অনুপ্রেরণার স্রোত হয়েছিল।

উদ্ধৃতি : সংস্কৃতের মতো পৃথিবীতে আর কোনো ভাষা নেই, এমনকী গ্রীকও নয়, যাতে আছে অতি উচ্চমানের দার্শনিক স্বচ্ছতা এবং নির্ভুলতা। এবং এই মহান ভারত যে সমস্ত কিছুরই শুরু করেছিল তাই নয়, প্রতিটি বিষয়েই ছিল শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তায়, আধ্যাত্মিকতায় অথবা রাজনৈতিকভাবে। গ্রীক ঐতিহ্যও তার তুলনায় বিবর্ণ দেখায়।

উৎস : অ্যাব্রাইস ও ইন্ডিয়া-ফ্রাঁসোয়া গাটিয়ার।

উদ্ধৃতি : প্রাচীন হিন্দুরা প্রকৃত ঈশ্বরের স্বরূপ জানতেন। তারা এক পরম ঐশ্বর্যশালী ভাষায় সেই সত্যের ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। তারা তার বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল এক আর্য ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। ইউরোপের সর্বোত্তম দর্শন, এমনকী গ্রীক দর্শনের শ্রেষ্ঠতাও যেন মনে হয় প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয় ভাববাদের দ্যুতি ও ঐশ্বর্যের সামনে অত্যন্ত ক্ষীণ— যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তিময় তেজোরাশির সামনে স্ফুলিঙ্গের এক কণিকা মাত্র।

উৎস : ফিলসফি, কাব্বালা অ্যান্ড বেদান্ত— মরিস ফ্রুগ্ল।

ডিক টেরেসি :

পরিচিতি : ইনি ছিলেন আমেরিকার পণ্ডিত, লেখক ও সাংবাদিক। তিনি বহু বিখ্যাত পত্রিকায় প্রধান সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। প্রখ্যাত পত্রিকা 'সাইন্স ডাইজেস্ট', 'লংজিভিটি' আর 'ওমনি' নামক পত্রিকার সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত পুস্তকগুলি হলো, 'দ্য গড পারটিকল— ইফ দ্য ইউনিভার্স ইজ দ্য আনসার, হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন?' এবং 'লস্ট ডিস্কভারি দ্য অ্যানসেন্ট রুটস অফ্ মডার্ন সাইন্স'।

উদ্ধৃতি : আইজ্যাক নিউটনের ২৪০০ বছর পূর্বেই হিন্দুদের ঋক্বেদে উল্লেখিত হয়েছিল 'মাধ্যাকর্ষণই' হচ্ছে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রাখার এক অমোঘ শক্তি। যখন গ্রীকরা পৃথিবীকে চেপ্টা বলে ভাবতো, সেই যুগেই সংস্কৃতভাষী আর্যরা পৃথিবীর বর্তুলাকার রূপটি জানত। পঞ্চম শতাব্দীতেই হিন্দুরা পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করেছিল ৪.৩ বিলিয়ন বৎসর আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা বলেন কিনা তা মাত্র ১০০ মিলিয়ন বৎসর।

উদ্ধৃতি : পুরাকালে কোপার্নিকাসের বহু আগেই হিন্দুরা জানতো, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। কেপলারেরও ১০০০ বৎসর পূর্বে তারা জানতো যে গ্রহমণ্ডলীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। তারা শূন্যের ও ঋণাত্মক সংখ্যার ব্যবহার ইউরোপীয়দের তুলনায় কমপক্ষে হাজার বছরেরও পূর্বে শুরু করেছিল। ইউরোপে লিব্নিজের চেয়েও বহু শতাব্দী পূর্বেই হিন্দুরা ভারতে ক্যালকুলাসের আবিষ্কার করেছিল।

উৎস : 'লস্ট ডিস্কভারি দ্য অ্যানসেন্ট রুটস অফ্ মডার্ন সাইন্স'— ডিক টেবেসি।

উদ্ধৃতি : ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কোপার্নিকাস, গ্যালেলিও এবং নিউটনের সময় থেকে অন্ততপক্ষে ১০০০ বৎসর পূর্বেই সৌরকেন্দ্রিক গ্রহমণ্ডলীয় তত্ত্বের এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সন্ধান পেয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দুদের 'আর্যভট্ট' ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে ইউরোপে এসেছিল। এই অনুবাদের পরই ইউরোপীয় গণিতবিদরা ত্রিভুজের বর্গফল, গোলকের আয়তন এবং সংখ্যার বর্গ ও ঘনমূল নির্ণয় পদ্ধতি শিখতে পেরেছিল। কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিওর অনুসন্ধানের পূর্বে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের কারণের ব্যাখ্যা, জ্যোৎস্নার উৎস যে সূর্য ইত্যাদি জ্ঞানের কথা ইউরোপের কাছে ছিল অজানা। অন্যদিকে ইউরোপীয়দের তুলনায় আর্যভট্ট অন্ততপক্ষে হাজার বৎসর পূর্বেই এইসব তথ্য জানতেন।

উদ্ধৃতি : হিন্দুরা যখন ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের হিসাব বিলিয়ান বৎসরে করতো, তখন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা তাকে কয়েক হাজার বৎসরে সীমায়িত করেছিল।

উদ্ধৃতি : প্রাচীনকালে হিন্দুরা আধুনিক যুগের আণবিক সূত্র, কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং অন্যান্য তত্ত্বের খুব নিকটেই আসতে পেরেছিল। হিন্দুরা বহু পূর্বেই পদার্থের পারমাণবিক গঠনের বিকাশ করতে পেরেছিল। ভারতের হিন্দুরা সম্ভবত পারসিক সভ্যতার মাধ্যমে গ্রীসের আণবিক তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ বৎসরে, ঋক্বেদ সাহিত্যে হিন্দুরা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সংক্রান্ত সূত্রাবলী লিপিবদ্ধ করেছিল। মহাজাগতিক সিদ্ধান্তগুলি ছিল মহাজাগতিক রশ্মি এবং বিশেষ রূপে 'ব্রহ্ম'-এর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

উৎস : 'লস্ট ডিস্কভারি দ্য এনসিয়েন্ট রুটস অফ্ মডার্ন সাইন্স'— ডিক টেরেসি।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি। সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী, নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

বসন্তে রঙের খেলা

বসন্তকাল নতুন জীবনের প্রতীক। শীতের রুক্ষতা দূরীভূত হয়ে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। গাছে গাছে নতুন পাতা, সবুজের সমাহার। নানা রঙের ফুলে ভরে ওঠে চারিদিক। শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার বাহারি রঙে চোখ জুড়িয়ে যায়। রঙিন প্রজাপতি ডানা

মেলে উড়ে বেড়ায় ফুলে ফুলে। মুকুলে ভরে ওঠে আমবাগান। প্রত্যুষ সূর্যদোয়ের সময় পাতাহীন গাছে লাল রঙের শিমুল ফুলগুলি যেন আরো রাঙা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফুলের এই আতিশয্য দেখেই গান বেঁধেছেন, 'ওরে আগুন লেগেছে বনে বনে।' বসন্তঋতুর এতো বাহার বলেই বসন্তকে বলা হয় ঋতুরাজ। এই বসন্তকালেই হয় রঙের উৎসব দোল। মানুষ একে অপরকে রাঙিয়ে দেয় নানা রঙে। যেন জীবনকে বর্ণময় ও সুন্দর করার এক প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে বাঙালি মানসে এই উৎসব নতুন চেতনা উন্মেষের প্রতিরূপ। কারণ, দোল পূর্ণিমাতেই জন্মগ্রহণ করেন নবজাগরণের অগ্রদূত শ্রীচৈতন্য। যিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সমাজে এক পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। ভগবান ও মানুষের মিলনকেও তিনি ভালোবাসার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এই দোল উৎসব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা হিসেবে পালন করা হয়। সারা দেশে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির প্রাঙ্গণ। এই উপলক্ষে বৃন্দাবনের দোল উৎসব খুব আকর্ষণীয়। বাংলায় হয় আবির খেলা। গ্রাম শহরের সব মানুষ রঙের খেলায় মেতে ওঠে। লাল, হলুদ কত রঙের আবির।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে এই উৎসবের সূচনা করে গেছেন। যা এখনো প্রতিবছর উদযাপিত হয়ে আসছে। এই দিন ছাত্রছাত্রী ও আশ্রমিকরা গান গাইতে গাইতে আবির খেলায় মেতে ওঠে, হয় আরও নানা অনুষ্ঠান।

ওই একই দিনে সারা দেশজুড়ে করা হয় হোলিকা দহন। রাক্ষসী হোলিকাকে প্রতীক রূপে দগ্ধ করা হয়। পাড়ায় পাড়ায় কাঠ, খড় জমা করে আগুন জ্বালিয়ে হোলিকারূপী অশুভ শক্তির বিনাশ করা হয়। আমাদের এখানে তা বহ্ন্যুৎসব বা চাঁচর নামে পরিচিত। একদিকে রঙের খেলা অন্যদিকে অশুভর বিনাশ, দুই মিলে দোল উৎসব হয়ে ওঠে নবজীবন প্রাপ্তির উৎসব।

বসন্তকাল পেরিয়ে গেলেই আসে নতুন বছর। সেই নতুন বছরকে স্বাগত জানাতেই বসন্ত যেন প্রকৃতিকে এতো সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে। আর বসন্তের এই দোল উৎসব নতুন বছরের আগে দ্বন্দ্ব ভেদ সবকিছু ভুলিয়ে রাঙিয়ে দেয় মানুষের মন।

আসন্ন দোল উৎসবে আমরা সবাই রঙ খেলবো, একে অপরকে রাঙিয়ে দেব। কিন্তু তার জন্য কিছু সতর্কতাও মনে রাখা উচিত। আজকাল বাজারে অনেক রকমের রঙ আবির পাওয়া যায় যেগুলি ত্বক ও চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই জৈবিক রঙের ব্যবহার শুরু হয়েছে। নানা রঙের ফুল, পাতা দিয়ে তৈরি হয় সেই রঙ। সবাই যদি সেই রঙ ব্যবহার করে তাহলে দোল উৎসব হয়ে উঠবে আরো সুন্দর।

—ত্রিদিব সোম

রাজ্য পরিচিতি

লাক্ষাদ্বীপ

ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপ। যা ভারতের মূল ভূ-খণ্ড থেকে ২০০-৪০০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এটি মালাবার উপকূলের অন্তর্গত। আয়তন ৩২ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৬৪, ৪২৯ জন। রাজধানী কাবারট্টি। প্রশাসনিক ভাষা মালায়লাম ও ইংরেজি। লাক্ষাদ্বীপে যারা বসবাস করে তারা বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষ বসবাস করে, সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। এখানকার অর্থনীতি মৎস্য সংগ্রহ ও পর্যটনের উপর নির্ভরশীল। এখানকার দৃষ্টিনন্দন সমুদ্রসৈকত, লাইট হাউজ পর্যটকদের কাছে খুব আকর্ষণীয়। স্বাধীনতার পর ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন পরিকল্পনায় লাক্ষাদ্বীপকে মাদ্রাজ থেকে আলাদা করা হয়। তারপর ১৯৯৩ সালে লক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিদিভি নিয়ে নামকরণ হয় লাক্ষাদ্বীপ।

এসো সংস্কৃত শিখি

भवत: का हानि: ?
আপনার কী ক্ষতি?
किमर्थम् एतावान् विलम्ब: ?
কী জন্য এত দেরি?
यथेष्टम् अस्ति।
যথেষ্ট হয়েছে।
भवत: अभिप्राय: क: ?
আপনার ইচ্ছা কী?
तस्य किं कारणम् ?
তার কারণ কী?

ভালো কথা

শিবলিঙ্গ উদ্ধার

পার্কের এক কোণে কেউ কোনো সময় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেখানে কেউ কেউ সিঁদুর লেপে পূজাও করে যেত। কিন্তু পার্কে মাটি কাটায় সেই শিবলিঙ্গটি মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। ফলে পুজোও বন্ধ। কেউ শিবলিঙ্গটি তোলার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। শিব চতুর্দশী এসে গেলেও পুজো করারও কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না। তখন আমরা একদিন বন্ধুরা মিলে মাটি সরিয়ে শিবলিঙ্গটিকে উদ্ধার করি। শিবরাত্রির দিন দুধ বেলপাতা দিয়ে পাড়ার সবাই পূজা করলো। এখন আবার কেউ কেউ প্রতিদিন জল দিয়ে ধুয়ে, সিঁদুর লেপে পূজা করে যায়।

পার্থপ্রতিম পাল, অষ্টম শ্রেণী, কৃষ্ণপুর, কলকাতা-১০২।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

প্রথম আলো

তন্ময় প্রামাণিক, সপ্তম শ্রেণী

সকালবেলার প্রথম আলো
সবার চেয়ে ভালো
ঝলমলিয়ে সোনার রঙে
দূর করে দেয় কালো।

বাঁশবাগানের আড়াল থেকে
সূয্যি যখন ওঠে
আকাশ ভরা গেরুয়া রঙে
সবাই ওঠে জেগে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 7059591955
E-mail : swastika5915@gmail.com
মেল করা যেতে পারে।

সন্তানের সংসারে কেমন থাকেন বৃদ্ধ বাবা-মায়েরা

অনন্যা চক্রবর্তী

বেশিরভাগ মানুষের ধারণা বিপদ সবসময় বাইরে থেকে আসে। কিন্তু নির্মম সত্যিটা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপদ ঘনিয়ে ওঠে আমাদের চেনা গণ্ডীর ভেতরে। বিশ্বস্ত পরিচিত মানুষেরাই হয়ে ওঠেন আমাদের দুঃখের কারণ। সম্প্রতি হেল্পএজ ইন্ডিয়া ভারতের ১২টি শহরে একটি সমীক্ষা করেছিল। উদ্দেশ্য, সন্তানের সংসারে বৃদ্ধ বাবা-মায়েরা কেমন থাকেন তার প্রকৃত মানচিত্রটির অন্বেষণ করা। সমীক্ষায় প্রবীণ নাগরিকেরা জানিয়েছেন, পরিবারের মধ্যে তাঁরা হিংসার শিকার হন।

ভারতে এখন প্রায় কুড়ি কোটি প্রবীণ নাগরিক বাস করেন। এই সংখ্যা আগামী তিন দশকে আরও বাড়বে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে মানুষের গড় আয়ু এখন বেড়েছে। ভারতের প্রতি চারজন প্রবীণের মধ্যে তিনজন এখনও তাঁদের সন্তানের সঙ্গে থাকেন। এখানে একটা সমস্যা হলো, জন্ম নিয়ন্ত্রণ নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মানায় হিন্দুদের জন্মহার এখন কম। কারওরই সন্তানসংখ্যা একটি-দুটির বেশি নয়। তাই স্বল্পসংখ্যক কিছু মানুষের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন প্রবীণ নাগরিকদের একটা বিরাট অংশ। স্বাভাবিক ভাবেই চাপ বাড়ছে এবং বেরিয়ে পড়ছে সম্পর্কের ফাটল।

সমীক্ষায় যতজনের মতামত নথিভুক্ত করা হয়েছে তাদের প্রায় অর্ধেক সন্তানদের হাতে বৃদ্ধ বাবা-মার দুরবস্থার জন্য একটি সাধারণ কারণকে চিহ্নিত করেছেন। সেটি হলো, বৃদ্ধ বয়েসে সন্তানদের ওপর আর্থিক নির্ভরশীলতা। পূর্ব দিল্লির কলের মিস্ত্রি মতিলাল এখনও কাজ করেন। কিন্তু ৭০ বছরের অশক্ত

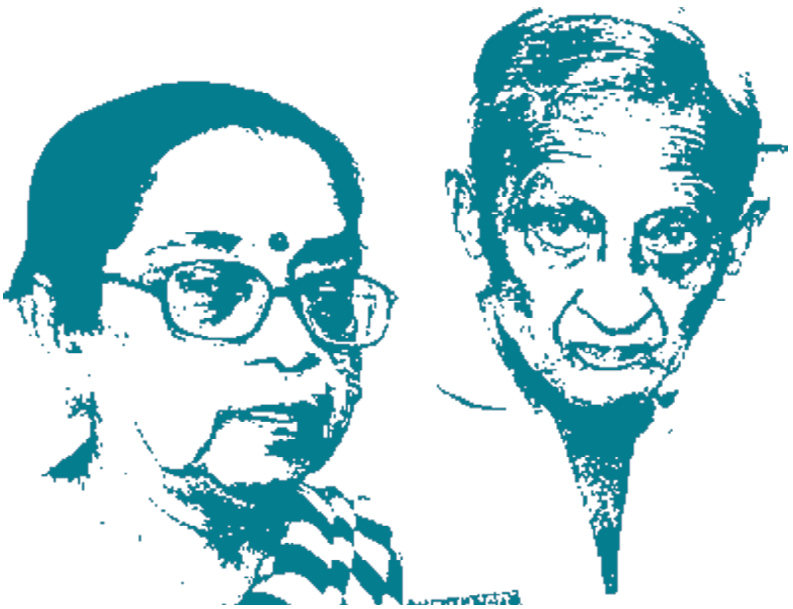

শরীরটা খাটিয়ে যা রোজগার করেন তাতে চলে না। ছেলে যেতে দেয় না। অসুখ-বিসুখে ওষুধপত্রও জোটে না। দিল্লিরই আরেক বাসিন্দা মানসী। দিনের শেষে তার বরাদ্দ দুটো চাপাটি। তার জন্যেও পুত্রবধূ কথা শোনাতে ছাড়ে না। ছেলের কাছে ক্যাটারাক্ট অপারেশনের টাকা চেয়েও পাননি। বেঙ্গালুরুর ফুলবিক্রেতা রামান্না স্ত্রীকে নিয়ে ছেলের কাছে থাকতে চেয়েছিলেন। কারণ বয়েসের কারণে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হকারি করতেও আর পারছিলেন না। কিন্তু একমাত্র সন্তান তাদের বাড়ির চাকর আর বাঁধুনি বানিয়ে ছাড়ল।

মধ্যবিত্ত সমাজের ছবিটা একটু অন্যরকম। দিল্লির মহিন্দারের বড়ো দোকান আছে। দোকান থেকে রোজগার হয় ভালোই। কিন্তু তার বড়ো ছেলে নেশার টাকা আদায় করার জন্য বাবা-মা-র ওপর যে অত্যাচার করে তাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। ছেলের বিরুদ্ধে তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে নারাজ। মুখ বুজে সহ্য করেন আর ছেলের অন্যায় আবদার মিটিয়ে চলেন। কলকাতার মালতী স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি মেয়েকে দিতে চেয়েছিলেন। তার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোক তাকে খুন পর্যন্ত করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

চেন্নাইয়ের পেনসনভোগী রেল কর্মচারী মণিলিঙ্গম দিনের পর দিন ছেলের অপমানজনক কথাবার্তা এবং মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একদিন কাউকে কিছু না বলে গৃহত্যাগ করে এখন একা থাকেন। তার মতো সাহস সকলের থাকে না। অসহ্য লাগলেও তাই পড়ে থাকেন। নাড়ির টান এত সহজে ঘোচে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে নাতির মুখ দেখতে ইচ্ছে করে। কিংবা স্কুল থেকে ফিরে নাতনি যেটুকু সময় কাছে থাকেই তাতেই অমৃত হয়ে ওঠে জীবনের বিষ। ■

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি বহুদিন ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী দল হিসেবে থাকবে

অতিথি কলম

আকার প্যাটেল

সারা ভারত জুড়েই বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় স্তরে প্রতিনিধি নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ ভোট পড়ছে। বাস্তবে যখন বিশেষ কোনো ইস্যু নিয়ে দেশব্যাপী বিতর্ক মাথা চাড়া দেয় তখনই এমন বিশাল সংখ্যায় ভোট পড়তে দেখা গেছে। সাম্প্রতিক কয়েকমাস ধরে ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকম দিকেই মোড় নিয়েছে। এর ফলে এমনটা বলা খুবই সহজ যে এই সমস্ত নির্বাচনগুলির ফলাফল এক হিসেবে মোদীর প্রশাসনিক নীতি ও তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ওপর একটি গণভোট (রেফারেন্ডাম)। আর এই গণভোট অবশ্যই সরকারের বিমুদ্রীকরণ নীতিতে জনতার অনুমোদন যাচাই করবে।

এই নিরিখে তুলনামূলকভাবে বড় কয়েকটি রাজ্যে পরাজয় হলে সেটি অবশ্যই মোদীর ব্যক্তিগত পরাজয় বলেই গণ্য হতে পারে। এরই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে তাঁর নীতির অসাফল্যে তাঁর ওপর তিরস্কার নেমে আসতে পারে। সেই সঙ্গে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার অননুকরণীয় স্টাইলেও বদল আনার জন্য চাপ আসতে পারে। এমনটা ভাবলে কিন্তু একেবারেই ভুল ভাবা হবে।

হ্যাঁ, ভারতীয় জনতা পার্টি দু' একটা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে পরাজিত হলো। এমনটা ঘটতেই পারে। যে ফলাফল ঘোষণা হতে আর মাত্র কয়েকটি সপ্তাহ বাকি আছে। যেমন পঞ্জাবে যেখানে জাট, শিখ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুর মিশ্রণে বিজেপি-অকালি জোট সরকার চলছে ১০ বছর ধরে। কিংবা উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে দল একটা শক্তিশালী জোটের বিরুদ্ধে একা লড়ছে যেমনটা বিহারে ঘটেছিল এবং সেখানে দল নির্বাচনে জিততে পারেনি। এর মধ্যে যে কোনো একটি রাজ্যে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে পরাজয় ঘটলে তা বিজেপিকে অবশ্যই আঘাত করবে এবং পরিণামে দলের চলতি এজেন্ডাতেও পরিবর্তন ঘটাতে হতে পারে। এই ফলাফলে অবশ্য রাজ্যসভায় অন্যরা যথারীতি এনডিএ-র থেকে সংখ্যাধিক্যে এগিয়ে থাকবে। আর অবশ্যই মিডিয়া বিশেষ করে ইংরেজি সংবাদমাধ্যমগুলি নেতিবাচক প্রচার চালাবার সাময়িক সুযোগ পাবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী একবার নয় ক্ষমতায় আসার পর বারবার তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রকাশ্যে বলেছেন— তিনি দেশবাসীর কোনো ক্ষতি হতে দেবেন না। সাম্প্রতিক প্রাকনির্বাচনী প্রচারেও দেখা যাচ্ছে কী অমিত স্নায়ুবল ও সাহসিকতার সঙ্গে তিনি জোটবদ্ধ বিরোধীদের মোকাবিলা করছেন।

কিন্তু যদি এই দুটি পরাজয় আদপে ঘটেও তারা কিন্তু মধ্যবর্তী বা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে কোনোভাবেই নরেন্দ্র মোদীর অকলঙ্কিত সুনামের ওপর কোনোই প্রভাব ফেলতে পারবে না। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে ভারতীয় রাজনীতিতে বহুকাল পরে এমন উচ্চতার একজন নেতা দেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর নিজস্ব ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ও সেই সঙ্গে আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত বিপুল জনপ্রিয়তা ভোটবাক্সে প্রতিফলনের বাইরেও অগ্রসরমান। যাঁরা তাঁর দলকে ভোট দিয়েছেন তার বাইরেও রয়েছে এই বিশাল জনগোষ্ঠী যাঁরা তাঁর অনুরাগী।

ধরুন যে বিশেষ কারণগুলি যেমন হিন্দুত্বের আদর্শ, ভদ্র ও নমনীয়তার সুনাম, দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকা, উচ্চবর্ণের মধ্যে দীর্ঘকালীন বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন ইত্যাদি যা বিজেপির

অর্জন সেই সুবিধেগুলি সবই এখন মোদীর সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে জমা পড়েছে। অন্যদিকে যে অনন্যসাধারণ সম্পদ তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর দলকে হস্তান্তর করেছেন সেই জনমোহিনী আবেদন তাঁর (কেবলমাত্র মমতা, জয়ললিতা বা মায়াবতীর) মধ্যে বহু মাত্রায় দেখা গেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে মোদীর মতো এত তীব্রভাবে জনমনে আলোড়ন অটলবিহারী বা রাজীব গান্ধী কেউই সেভাবে তুলতে পারেননি।

এই গুণাবলী মোদী অর্জন করেছেন নানা বিষয়ের সমাহারে যার মধ্যে তাঁর অমলিন সততা, নিজস্ব কোনো পারিবারিক সম্পদ বৃদ্ধি করার তিলমাত্র মানসিকতা না থাকা (যা তাঁর সুনামের ওপর থাবা বসাতে পারে), মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র তৈরি করার ঈর্ষণীয় ক্ষমতা, সর্বোপরি বিরোধীদের খুব সহজেই দুর্বল ও অকিঞ্চিৎকর করে দেওয়ার বিরল প্রতিভা। এই গুণগুলি তিনি দীর্ঘদিন ধরেই আত্মস্থ করে রেখেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে যদিও বা কেউ তাঁর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির দিকে নেতিবাচকতার দায় চাপায় তাতেও তাঁর কোনো হেরফের হবে না।

একথা সত্যি, ক্ষমতার কোনো কোনো অলিন্দে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ও একক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ সাফল্যের দাবিদার হওয়া নিয়ে কিছু কিছু অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত হয়তো প্রশ্নের মুখে পড়ছে। কিন্তু এই সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে তিনি বেশি সময় রাজনৈতিকভাবে আবদ্ধ থাকবেন না। এদেশের নাগরিকদেরও একটি বিষয় নিয়ে আটকে থাকার ট্রাডিশন নেই।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, না জওহরলাল না ইন্দিরা গান্ধী কেউই তেমন শক্তপোক্ত অর্থনৈতিক সাফল্য দেখাতে পারেননি। প্রশাসনিক ক্ষেত্র অর্থাৎ দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁরা কেউই উচ্চমাত্রার প্রশংসনীয় সাফল্যের দাবিদার হতে পারেননি। অথচ তাঁরাই কিন্তু পূর্ণ বহুমত নিয়ে সরকার গড়েছেন। একবার নয় বারবার। কিন্তু রহস্যটা কী! কারণ একটাই— তাঁদের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও জনতার সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ানে মিশে যাওয়ার বিরল দক্ষতা। তাই মোদীর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটবে না সেটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কী যদি তর্ক করতে হয় তাহলে বলতে হবে উল্লেখিত দু'জনের তুলনায় তিনি উৎকর্ষে অনেক এগিয়ে।

মনে রাখতে হবে, নরেন্দ্র মোদী তাঁর রাজনৈতিক মূলধন সংগ্রহ করেছেন কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে। তিনি ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে সফলভাবে দেশবাসীকে বোঝাতে পেরেছেন যে, দেশের যে সমস্যাগুলিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন দেশবাসী তাঁর সঙ্গে একমত। একক প্রচেষ্টায় যে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব তার পর্যাপ্ত প্রমাণ তিনি সাধারণ নির্বাচনে রেখেছিলেন। তাঁর ধ্যান ধারণাকে মানুষ পূর্ণ মর্যাদায় স্বীকৃতি দিয়েছিল। তিনি একবার নয় ক্ষমতায় আসার পর বারবার তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রকাশ্যে বলেছেন— তিনি দেশবাসীর কোনো ক্ষতি হতে দেবেন না। সাম্প্রতিক প্রাকনির্বাচনী প্রচারেও দেখা যাচ্ছে কী অমিত স্নায়ুবল ও সাহসিকতার সঙ্গে তিনি জোটবদ্ধ বিরোধীদের মোকাবিলা করছেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি বিরল দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন। যেমন দেশের একের পর এক রাজ্যের প্রতিটি নির্বাচনেই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সুনাম ও দক্ষতাকে বাজি ধরে নির্বাচন লড়ছেন। অতীত হাতড়ালে এমন কোনো নেতার নাম স্মরণে আসবে না। কিন্তু তিনি উপর্যুপরি নিজেকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে তুলছেন। তাই বলছি, যাঁরা তার ওপর বিশ্বাস রেখেছিল তারা এখনও সেই বিশ্বাস অটুট রাখবে। উত্তরপ্রদেশে হারতে হলে হুল ফুটবে। যন্ত্রণাও হবে। কিন্তু একটা মাত্রার পর তার ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। মোদীর রাজনৈতিক পরিকল্পনা, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা ভাবনাগুলি নিয়ে বিরুদ্ধ মত পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভা প্রশ্নাতীত। বিরোধী দলগুলি এ বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষমতার পরিচয় এ যাবৎ দিতে পারেনি। অঙ্কের সংখ্যায় বললে তাদের অর্জিত নম্বর শূন্য।

তাই একথা সহজ বিশ্লেষণেই বলা যায় যে তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি আরও বহুদিন ভারতীয় রাজনীতিতে প্রধান প্রধান্যবিস্তারকারী দল হিসেবে থাকবে। এই সত্য যাদের পছন্দ হবে না বা তাঁর নীতির যাঁরা বিরোধী তাদের কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে। এ যাবৎ আদর্শগতভাবে যাঁরা মোদীর বিরোধিতা করে নিজেদের উদারবাদী বলে জাহির করেছেন তাঁরা আসলে মোদীর গৃহীত নীতিগুলিকে তাঁদের মধ্যে গেড়ে বসা তীব্র ঘৃণার মানসিকতা থেকেই প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কিন্তু পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

(লেখক সংবাদ ভাষ্যকার)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

গো-ভিত্তিক নৈসর্গিক কৃষি মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক

অধ্যাপক নির্মল মাইতি

(কেবল একটি দেশি গোরুর মাত্র ৩০ দিনের গোবর ও গোমূত্র দ্বারা ৩০ একর জমি চাষ করা যায়।)

কৃষিবিজ্ঞানী শ্রী সুভাষ পালেকর ১৯৪৯ সালে মহারাষ্ট্রে বিদর্ভ অঞ্চলে বেলোরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে কৃষিবিদ্যা নিয়ে শিক্ষাকালে তিনি সাতপুরা অঞ্চলে বনবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করেন। তারপর ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সময়কালে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে রাসায়নিক কৃষি উৎপাদন শুরু করেন। ১৯৭২-৮৫ সময়কালে তিনি দেখলেন— প্রতি বছর তাঁর উৎপাদন বাড়ছে। কিন্তু তারপর তা কমতে থাকল। তিনি এর কারণ অনুসন্ধানে গবেষণা শুরু করলেন। এখন তার সিদ্ধান্ত হলো— বর্তমান কৃষিবিজ্ঞান একটি বড় ধোঁকা এবং বহুজাতিক চক্রান্ত, যার দ্বারা গ্রামের কৃষক লুণ্ঠিত হচ্ছে এবং গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাঁর গবেষণা-লব্ধ কৃষিপদ্ধতি হলো Zero Budget Spiritual Farming–ZBSF —নিঃশুল্ক নৈসর্গিক কৃষি। এর জন্য তিনি ২০০৫ সালে কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ মঠ দ্বারা বাসবশ্রী পুরস্কার (যা তাঁর পূর্বে দলাই লামা, মেধা পাটেকার, ড. এ পি জে আব্দুল কালাম প্রমুখ প্রাপ্ত হয়েছেন।) এবং কর্ণাটক রাজ্য রায়ত সংস্থা দ্বারা ভারত কিষাণ রত্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১৬ সালে তিনি ভারত সরকার দ্বারা পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

আমাদের গ্রামগুলি আগে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। বিচার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা সামাজিক প্রয়োজন সবই গ্রামেই বিদ্যমান ছিল। গ্রামের মধ্যে বাস ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, শ্রমিক— সবার। গ্রামেই ছিল সুন্দর বিচার ব্যবস্থা। বিবাদের বিষয়ে বিচারকের সম্যক পূর্বজ্ঞান থাকত এবং বাদী-বিবাদী উভয়ের সম্পর্কেই তাঁরা অবহিত থাকতেন। ফলে সুষ্ঠু বিচার সম্ভব হোত। কিন্তু বিজ্ঞান তার স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে ভেঙে দিয়েছে, তাকে শহরের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। কৃষকরা গোরুর গোবর, গোমূত্র প্রভৃতির সাহায্যে চাষ করত। ঘরের বীজেই চাষ হোত। তাতে পোকামাকড়ের এত উপদ্রব ছিল না। আর ফসলগুলি এত রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ত না। ফসল হোত সুস্বাদু। গ্রামের টাকা গ্রামেই থাকত, সবার মধ্যে সুখ-শান্তি বিরাজ করত। কিন্তু ৬০-এর দশক থেকে সবুজ বিপ্লবের নামে হাইব্রিড বীজ, রাসায়নিক সার, ক্ষতিকারক কীটনাশক,

সুভাষ পালেকর

আগাছা নাশক প্রয়োগ করার ফলে জমির মাটি দূষিত হচ্ছে, অম্লের আধিক্য বা হ্রাস ঘটছে। বেশি জলের প্রয়োজন হচ্ছে, জলবদ্ধতা বাড়ছে। আবার মাটি থেকে বেশি জল তুলে নেওয়ার ফলে গ্রীষ্মে জলস্তর নেমে যাচ্ছে, খরা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এর জন্য আর্সেনিক সমস্যা হচ্ছে, যার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় দু'টি মৃত্তিকা কণার মধ্যে বায়বীয় ফাঁক থাকে, তার মধ্য দিয়ে জল মাটির ভিতরে প্রবেশ করে, বায়ু চলাচল করে। কিন্তু এই ফাঁকে রাসায়নিক সার প্রবেশ করে মাটিকে সিমেন্টের মতো কঠিন ও অভেদ্য করে দেয়। জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। জল ভিতরে ঢুকতে না পেরে মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় উপরের উর্বর মৃত্তিকা ধুয়ে দিয়ে যায়। এটি মাটির স্বাস্থ্যের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি।

কীটনাশক প্রয়োগের ফলে কৃষক-বন্ধু মৌমাছি, কেঁচো, পাখি প্রভৃতি মারা পড়ছে। উৎপন্ন শস্য ও ফলগুলি বিষময় হচ্ছে, যা খেয়ে আমরা বিভিন্ন রোগের শিকার হচ্ছি, আমাদের কর্মদক্ষতা কমে যাচ্ছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত জাহাজ ভর্তি আম, চা, বিভিন্ন ফল প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসছে।

পঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব খুব বেশি হয়েছে। সেখানে এখন ক্যান্সারের ছড়াছড়ি। সেখানে একটি ট্রেন আছে— ৩৩৯ নং প্যাসেঞ্জার এক্সপ্রেস। ভাতিন্দা থেকে বিকানীর যায়। রাজস্থানের বিকানীরে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল আছে— সেখানেই চিকিৎসার জন্য সব আসে। এটিতে এত বেশি ক্যান্সার রোগী আসে যে ট্রেনটি 'ক্যান্সার এক্সপ্রেস' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

উৎপাদন বাড়াতে কৃষক আরো বেশি সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করছে। ফলে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে। প্রতি বছর এই খাতে প্রায় ৫০ লক্ষ কোটি টাকা বহুজাতিক সংস্থাগুলি নিয়ে যাচ্ছে। আবার এত খরচ করে বেশি উৎপাদন মানেই বেশি লাভ নয়। অধিক উৎপাদন হলে দাম প্রচুর কমে যায়, যা আলুচাষের ক্ষেত্রে প্রায়ই হয়ে থাকে, চাষিরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। খরা বা দুর্ভিক্ষ হলে রাসায়নিক কৃষি পুরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেখানে প্রাকৃতিক কৃষির প্রতিরোধ শক্তি অনেক বেশি। সুভাষ পালেকর এই পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণাকালে দেখলেন— অরণ্যের মধ্যে গাছগুলিকে তো মানুষ কোনো যত্ন করে না, সার-ওষুধ দেয় না। কিন্তু গাছগুলি সব সতেজ, সবুজ, সবল হয় এবং সুপুষ্ট ফল প্রদান করে। তিনি এর রহস্য উন্মোচনে প্রবৃত্ত হলেন। অরণ্যে তাঁর পর্যবেক্ষণ বেশ চিত্তাকর্ষক এবং যুক্তিপূর্ণ। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান বলছে— গাছ তার ৯৮.৫ শতাংশ খাদ্য সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে তৈরি করে, বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে এবং সূর্যালোকের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে। সবুজ পাতার প্রতি বর্গফুটে ৪.৫ গ্রাম শর্করা উৎপন্ন হয়। মাত্র ১.৫ শতাংশ খাদ্য খনিজ পদার্থ, নাইট্রোজেন প্রভৃতি ভূমি থেকে সংগ্রহ করে। মাটিতে এই সব পুষ্টি-উপাদানগুলি প্রভূত মাত্রায় থাকে এবং গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে তা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেগুলি গাছের বা ফসলের সরাসরি গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। অণুজীব এবং কেঁচো এগুলিকে গাছের গ্রহণযোগ্য খাদ্যে রূপান্তরিত করে। আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো— অণুজীব বৃদ্ধি করা এবং তার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। এজন্য জীবামৃত এবং আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হয়।

অরণ্যে তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, বৃক্ষে প্রচুর পাখি, কীট-পতঙ্গ, অনেক জীবজন্তু বাস করে। আবার মাটিতেও অনেক কেঁচো, পিঁপড়ে ও পোকামাকড় বাস করে। তাদের মলমূত্র মাটিতে মেশে, নিশ্চয়ই তার সঙ্গে গাছের বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক আছে। তিনি দেখলেন যে গাছের ছায়া অঞ্চলে শিকড়ে পিঁপড়ে ও নানা কীটপতঙ্গ কাজ করছে। গাছ তাদের আকর্ষণ করার জন্য তার মূল এবং শিকড় থেকে কিছু মিষ্টরস নিঃসৃত করে। এই মিষ্টরসের আকর্ষণে এসে অনুজীবগুলি গাছের খাদ্য তৈরি করে। আবার গাছের নিচে প্রায় ২৬৮ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রয়েছে, তার ৩ ভাগ দ্বিবীজপত্রী ও ১ ভাগ একবীজপত্রী। দ্বিবীজপত্রী গাছগুলির বীজগুলি সূর্যালোকসম্পৃক্ত প্রোটিনে সমৃদ্ধ থাকে। সেগুলি মাটিতে মিশে গিয়ে অণুজীবের খাদ্যে পরিণত হয়। তার থেকে সিদ্ধান্ত নিলেন যে দ্বিবীজ ডালের গুঁড়ো বা বেসন দ্বারা অণুজীবের বংশ বৃদ্ধি করা যাবে। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষাগারে গোবর পরীক্ষা করে দেখেছেন— দেশি গোরুর গোবরে ৩০০ কোটি থেকে ৫০০ কোটি অণুজীবী থাকে। জার্সি, হলস্টিন বা শঙ্কর গোরুর ক্ষেত্রে সেটা ৭০ লক্ষ মতো। তাই দেশি গোরুর টাটকা গোবরই উপযুক্ত। দেশি গোরুর অভাবে দেশি বলদ বা মহিষের গোবর মেশানো যেতে পারে। যে গাভী যত কম দুধ দেয় ও যত বয়স্ক, তার গোবর ও মূত্র তত কার্যকরী।

ছ' বছর ধরে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ তিনি জীবামৃত আবিষ্কার করেন। এর তৈরি পদ্ধতি ও প্রয়োগ খুবই সরল। একটি পাত্রে ২০০ লিটার দেশি গোবর, ৫-১০ লিটার গোমূত্র, ২ কিলোগ্রাম ডালের আটা বা বেসন, ২ কিলোগ্রাম গুড় এবং একমুঠ জমির মাটি একসঙ্গে নিয়ে একটি ডাণ্ডার সাহায্যে দিনে দু'বার নাড়তে হবে এবং খালি পাটের বস্তা দিয়ে মুখটি ঢেকে ছায়ায় রেখে দিতে হবে। ৪৮ ঘণ্টা পর জীবামৃত তৈরি হয়ে গেল। এটি সপ্তাহে একবার জলসেচের সময় বিন্দু বিন্দু করে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে অথবা গাছের পাতায় স্প্রে করা যেতে পারে। বড় গাছের ক্ষেত্রে মাসে একবার করে দিতে হবে। জীবামৃত হলো অণুজীবের ভাণ্ডার। এই অণুজীবগুলিই মাটির অভ্যন্তরের পুষ্টি উপাদানগুলিকে গাছের উপযোগী খাদ্যে পরিণত করে শিকড়ে পৌঁছে দেয়। বলা হয়— হিন্দুদের ৩৩ কোটি দেবতা। সুভাষ পালেকরের মতে, অণুজীবগুলিই আমাদের দেবতা। তারাই আমাদের খাদ্যের জোগান দেয়।

তরল জীবামৃত ছাড়াও ঘনজীবামৃতও আছে। ১০০ কিলোগ্রাম গোবর, ২ কিলোগ্রাম গুড়, ২ কিলোগ্রাম বেসন আর একমুঠো মাটি ও পরিমাণ মতো গোমূত্র এক সঙ্গে মাখিয়ে ছায়ায় শুকতে হবে। তারপর গুঁড়িয়ে নিতে হবে। বাড়ির পচা সারের সঙ্গে ১০ : ১ অনুপাতে মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। শুকনো অবস্থায় অণুজীবগুলি সমাধি অবস্থায় থাকে, অনুকূল পরিবেশ পেলে সক্রিয় হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, যখন মাটিতে গোবর পড়ে থাকে, গোবর উঠালে দেখি, বাসি গোবরের নীচে কেঁচো ও অন্যান্য পোকা আশ্রয় নিয়েছে। ঠিক তেমনি জীবামৃতের গন্ধে কেঁচো ও অন্যান্য অণুজীব আকর্ষিত হয়ে উপরে

আসে।

আচ্ছাদন প্রক্রিয়া অণুজীবের অনুকূল পরিবেশ এবং মাটির স্বাস্থ্যপুরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যদি ১০০ কিলোগ্রাম সবুজ পাতা রৌদ্রে শুকানো হয়, তার ওজন কমে ২২ কিলোগ্রাম হয় অর্থাৎ ৭৮ কিলোগ্রাম পদার্থ বায়ুতে চলে যায়। এই শুকনো পাতাগুলি পোড়ালে মাত্র ১.২৫ কিলোগ্রাম ছাই অবশিষ্ট থাকে। সালোকসংশ্লেষের সময় যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করেছিল, তাই আবার বায়ুতে ফিরে যায়। এই ১.২৫ কিলোগ্রাম পদার্থই গাছ মাটি থেকে নিয়েছিল।

প্রকৃতিতে অরণ্যে স্বাভাবিকভাবেই নিয়মিত পত্রমোচন হয় যা বৃক্ষতলে সঞ্চিত হয়। এগুলি কেঁচো এবং অণুজীবের অনুকূল পরিবেশ এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। অণুজীব ও কেঁচোর জন্য অন্ধকার, শীতল (২৪° সে.-৩২°সে.) এবং আর্দ্র পরিবেশ (৬৫ থেকে ৭৫ শতাংশ আর্দ্রতা) প্রয়োজন হয়। তাই আচ্ছাদন না থাকলে প্রখর সূর্যালোকে কেঁচো ও অণুজীবগুলি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। স্খলিত পত্রগুলি পচে কেঁচো ও অণুজীবের খাদ্য সরবরাহ করে, তাদের বংশ বৃদ্ধি করে। ফলে পত্রের পচন, কেঁচো ও অণুজীবের মল ও তাদের মৃতদেহ দিয়ে মাটির সবচেয়ে উপরের স্তর লঘুমৃত্তিকা হিউমাস তৈরি হয়। ঈশ্বর বা প্রকৃতি বিশেষ ব্যবস্থা— উদ্ভিদজগতে মাটির স্বাস্থ্য নির্মাণে অণুজীব ও কেঁচোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছেন। এরাও গাছের জন্য নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, লৌহ, সালফার, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি উপাদানকে গাছের মূলে এবং শিকড়ে সরবরাহ করে। কেঁচোর মলে মাটির থেকে সাতগুণ নাইট্রোজেন, নয়গুণ ফসফেট, এগারোগুণ পটাশ, ছয়গুণ ক্যালসিয়াম, আটগুণ ম্যাগ্নেসিয়াম, দশগুণ সালফার এবং অন্য খাদ্যগুণ প্রচুর মাত্রায় থাকে।

প্রকৃতি অরণ্যে স্বাভাবিক ভাবেই পত্রমোচন এবং মৃত উদ্ভিদ দেহাবশেষ দিয়ে আচ্ছাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। কিন্তু কৃষি ফসলের ক্ষেত্রে আমরা পরিপক্ব ফসলের পুরোটাই সংগ্রহ করি। সে জন্য যখন চাষ হচ্ছে না, তখন পচা খড়, ঘাস, পাতা দিয়ে জমি ঢেকে দিতে হবে (ফসল থাকা কালেও যেসব গাছ বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে থাকে যেমন, বেগুন বা ঢেঁড়স, গাঁদা প্রভৃতি, তাদের গোড়ায় এই আচ্ছাদন দেওয়া যায়)। তার ফলে সূর্যালোক না পেয়ে আগাছা জন্মাবে না, দু' একটি জন্মালেও সেগুলি খুব দুর্বল হবে, গাছের ক্ষতি করতে পারবে না। বাতাসে বাহিত হয়ে যেসব বীজ উঠে আসে, সেগুলি আচ্ছাদনের উপর পড়ে, মাটির সংস্পর্শ না পাওয়ায় জন্মাতে পারে না। আর্দ্র ও অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকায় অণুজীব ও কেঁচো সক্রিয় হয় ও খাদ্য নির্মাণকারী শিকড়ে খাদ্যগুলি সরবরাহ করে। আচ্ছাদনের ফলে ঝড় বৃষ্টি বা তুষারপাতের অভিঘাত প্রতিহত হয় এবং বৃষ্টি ছড়িয়ে গিয়ে গতিহীন হয় ও মাটির অভ্যন্তরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবেশ করে। আচ্ছাদন না থাকলে প্রবল বৃষ্টিতে উপরের উর্বর মাটি হিউমাস ধুয়ে যায়। এটি মাটির পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। সেজন্য বনে দেখা যায়— বৃষ্টি হলে স্বচ্ছ জল প্রবাহিত হয়। কিন্তু চাষের জমিতে মাটি ধুয়ে ঘোলাজল প্রবাহিত হয়। আর একটি পদ্ধতি হলো সবুজ সজীব আচ্ছাদন। বনে দেখা যায় বৃহৎ বৃক্ষ, মাঝারি বৃক্ষ, ঝোপঝাড় এবং তৃণস্তর। সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে সাথী ফসল এবং মিশ্র ফসলের চাষ করা হয়। তাতে লাভও বেশি হয়। প্রকৃতি পারস্পরিক সম্যক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। কিছু গাছ মুক্ত প্রখর সূর্যালোক চায়, কিছু গাছ ছায়া বা কম প্রখরতা চায়। সব গাছই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী। একবীজপত্রী উদ্ভিদ পটাশ, ফসফেট, সালফার ইত্যাদি এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদগুলি নাইট্রোজেন সরবরাহ করে পারস্পরিক সাহায্য করে। এইভাবেই মিশ্রচাষ দ্বারা সবুজ আচ্ছাদন সম্ভব। এর মধ্যে উজ্জ্বল ফুলের গাছ থাকলে তা মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে পরাগমিলনে সাহায্য করে। মিশ্র চাষের বিশদ বিবরণ সুভাষ পালেকার তাঁর বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্ষাকালে গাছ সহজেই জল পায়। তারপর রৌদ্র বাড়লে মাটিতে ফাটল বা কৌশিক নালিকা দেখা দেয়। সেই কৌশিক টানে জল উপরে উঠে আসে। তখন তার সঙ্গে ধাতুগুলি দ্রবীভূত হয়ে উপরে উঠে আসে এবং গাছের শিকড়ে উপলব্ধ হয়। উল্লেখ্য, মাটির গভীরতার সঙ্গে ধাতু বা পুষ্টির মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। আবার আচ্ছাদন থাকলে এবং জীবামৃত প্রয়োগ করলে কেঁচো ও অণুজীবগুলি নীচ থেকে উপরে আসে। তার ফলেও কৌশিক নালিকার সৃষ্টি হয়।

নিঃশুল্ক কৃষির তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো ওয়াফসা। ওয়াফসা মৃত্তিকার মধ্যে এরূপ আবহ রচনা করে যাতে দু'টি মৃত্তিকা কণার মাঝের ফাঁক অংশে ৫০ শতাংশ জলীয় বাষ্প

রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী সুভাষ পালেকরকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করছেন।

এবং ৫০ শতাংশ বাতাস থাকে। গাছের শিকড় জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে। ৯২ শতাংশ অণুজীব এবং ৮৮ শতাংশ মূলরোম ভূমি পৃষ্ঠ থেকে ১০ সেমি গভীরতা পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। ফলে এই অঞ্চলে ওয়াফসা বজায় রাখতে হয়। যদি মধ্যাহ্নকালে বৃক্ষের ছায়া অঞ্চলের সীমানায় একটি নালি কেটে জল দেওয়া হয়, তাহলে ওয়াফসার সৃষ্টি হয়, কেননা জলগ্রহণকারী মূলরোমগুলি এই অঞ্চলেই বিস্তৃত থাকে।

বীজবপনের আগে বীজামৃত দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। কিন্তু যে কৃত্রিম ছত্রাকনাশক বা রাসায়নিক দিয়ে শোধন করা হয়, তা বন্ধু অণুজীবগুলিকে বিনাশ করে। অঙ্কুরিত হওয়ার পর যখন উদ্ভিদগুলি বাড়তে থাকে, এই বিষগুলি উদ্ভিদ দেহে এবং ফলে প্রবেশ করে। এগুলি খাওয়ার পর আমাদের শরীরে যক্ষ্মা, ক্যান্সার, বহুমূত্র, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে। খুব সহজেই বীজামৃত তৈরি করা যায়। উপকরণ ২০ লিটার জল, ৫ কিলোগ্রাম গোবর, ৫ লিটার গোমূত্র, ৫০ গ্রাম চুন এবং জমির একমুঠো মাটি।

পদ্ধতি : একটি কাপড়ে গোবর বেঁধে ২০ লিটার জলে রাত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে। আর একটি পাত্রে ১ লিটার জলে ৫০ গ্রাম চুন সারারাত্রি ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে গোবরের কাপড়টি মুচড়ে এর নির্যাস দ্বিতীয় পাত্রটিতে নিতে হবে। এর সঙ্গে এক মুঠো মাটি মিশিয়ে দিতে হবে এবং ৫ লিটার গোমূত্র ঢালতে হবে। ভাল করে নেড়ে নিতে হবে। বীজামৃত তৈরি হয়ে গেল।

ব্যবহার : বীজগুলিকে কোনো কিছুর ওপর মেলে দিতে হবে। তার উপর বীজামৃত ছিটিয়ে হাতে করে ঘষে দিতে হবে। তারপর শুকিয়ে নিয়ে বপন করতে হবে। আর চারা গাছগুলি রোপণ করার আগে বীজামৃততে চুবিয়ে নিতে হবে।

প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেই আক্রমণকারী কীটপতঙ্গ এবং গাছের রোগ নিবারণ করতে হবে। সাধারণত যে গাছগুলিকে গোরু-ছাগল খায় না যেমন— আতা, আকন্দ, ধুতরা, তামাক, নিম প্রভৃতি, এগুলি পোকামাকড়কে বিকর্ষণ করে। এই পাতাগুলি গোমূত্রের সঙ্গে মিশিয়ে কীটনাশক এবং রোগের ওষুধ তৈরি করা হয়।

এইগুলির বিভিন্ন নাম তিনি দিয়েছেন—

১. নিমাস্ত্র : ১০০ লিটার জলে ৫ কিলোগ্রাম গোবর, ৫ লিটার গোমূত্র এবং ৫ কিলোগ্রাম নিমের পাতার মণ্ড ভাল করে নেড়ে মিশিয়ে ২৪ ঘণ্টা গাঁজিয়ে নিতে হবে। দু'বার নাড়তে হবে। তারপর কাপড়ে ছেঁকে ফসলের উপর স্প্রে করতে হবে। চোষক পোকা দমনে বিশেষ কার্যকরী।

২. অগ্নিঅস্ত্র : ১০ লিটার গোমূত্রের সঙ্গে ১ কিলোগ্রাম তামাকপাতা চূর্ণ, ৫০০ গ্রাম কাঁচালঙ্কা এবং ৫০ গ্রাম রসুন বেটে তার সঙ্গে ৫ কিগ্রা নিমের মণ্ড মিশিয়ে ৫ বার ফোটাতে হবে। তারপর ছেঁকে নিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। এর দ্বারা পাতা মোড়া পোকা, গাছের কাণ্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. ব্রহ্মাস্ত্র : ৩ কিলোগ্রাম নিম পাতা, ২ কিলোগ্রাম আতা পাতা, ২ কিলোগ্রাম পেঁপে পাতা, ২ কিলোগ্রাম সাদা ধুতরা পাতা, ২ কিলোগ্রাম করবী পাতা বা রেড়ি পাতা বা পেঁপে পাতা বেটে ১০ লিটার গোমূত্রর সঙ্গে মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফোটাতে হবে। ৪৮ ঘণ্টা পর কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। ব্রহ্মাস্ত্র তৈরি হয়ে গেল। এ ধরনের আরো কিছু ভেষজ ওষুধ আছে যা পোকা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ করে। সুভাষ পালেকারের নিঃশুল্ক কৃষি পদ্ধতি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে এবং আমাদের আশে পাশে উপলব্ধ সামগ্রী দিয়েই এই চাষ করা সম্ভব। এখন রাসায়নিক চাষের বিকল্প হিসেবে জৈব চাষের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু জৈব চাষও বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল। বিশেষত কেঁচো সার তৈরিতে যে বিদেশি কেঁচো ব্যবহার করা হয়, সেগুলি আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কেঁচোগুলি সীসা, ক্যাডমিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ভারী ধাতু খায় এবং তা এদের মল বা মৃতদেহে থাকে। সেটাই কেঁচো সারে যুক্ত হয়। এই সার গাছে বা ফসলে দিলে ভারী ধাতুগুলি উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে এবং শস্য দানা বা ফলের মধ্যে চলে আসে, যা খেলে মানুষের শরীরে ঢোকে এবং স্বাস্থ্যহানি হয়। জৈব সারের দামও যথেষ্ট এবং বেশি পরিমাণে লাগে। ফলে রাসায়নিক চাষের মতোই ব্যয়বহুল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অস্ত্র নির্মাণকারী কারখানাগুলি বেশ সঙ্কটে পড়ে। তাদের মধ্যে রাসায়নিক অস্ত্র নির্মাণকারী কারখানাও প্রচুর ছিল। এই সমস্ত কারখানাগুলিই কৃষি যন্ত্রপাতি ট্রাক্টর, স্প্রেয়ার, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি তৈরি করতে শুরু করে। এজেন্ট অরেঞ্জ নামে বিষাক্ত রাসায়নিক ভিয়েতনাম যুদ্ধে ছোট ছোট কাঁটা ঝোপ মারতে ব্যবহার হোত। তাই পরে আগাছা নাশক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ডি ডি টি এবং বি এইচ সি বাইরের দেশে বন্ধ হলেও ভারতে এখনো তা চলছে। এগুলি প্রত্যক্ষভাবে বায়ুদূষণ, জলদূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, স্বাস্থ্য দূষণ, আর্থিক দূষণ, সমাজ দূষণ, পরিবেশ দূষণ, সার্বিক দূষণ ঘটাচ্ছে। এসব থেকে মুক্তি পেতে সুভাষ পালেকরের নিঃশুল্ক কৃষিপদ্ধতি স্থায়ী সমাধান প্রদান করে। ট্রাক্টর দিয়ে গভীরে মাটি খননের ফলে কৌশিক নালিকাগুলি কেটে যায় এবং জলস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটি শুকিয়ে যায় এবং অণুজীব ও কেঁচো মারা যায়। সেক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়ে জমি চষা কৃষির পক্ষে উপকারী। দাক্ষিণাত্যে প্রায় ৪০ লক্ষ কৃষক তাঁর এই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যসরকার তাদের কৃষক ও কৃষিকর্মী, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদেরকে সুভাষ পালেকারকে দিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তিনি দেশের বাইরেও শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে গোরক্ষণ, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে হবে। আমরা শুদ্ধ আহার পাব, শুদ্ধ মনের অধিকারী হব, শুদ্ধ চিন্তনে সমর্থ হব। এটিই সবকিছু সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান। সম্প্রতি দিল্লি ও সন্নিহিত অঞ্চলে শস্যের খড় পোড়ানোর ফলে ব্যাপক বায়ুদূষণের সৃষ্টি হয়, বহু উড়ান ও ট্রেন বাতিল করতে হয়। কিন্তু এগুলি আচ্ছাদন রূপে ব্যবহার করতে পারলে এই সমস্যার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বাস্তবে দেখা গেছে— এই পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশি বীজের সাহায্যে চাষ করে বেশি ফলন ও বেশি আয় করা সম্ভব হয়েছে। আমরা যত তাড়াতাড়ি গো-আধারিত নিঃশুল্ক কৃষি গ্রহণ করব, ততই সমাজ, দেশ, জাতি ও পৃথিবীর মঙ্গল।

উৎস :

১. http://www.palekarzerobudgetspiritualfarming.org ২. *সুভাষ পালেকর গ্রন্থাবলী।*

(লেখক বিজ্ঞানের অধ্যাপক)

অন্য রকম

উর্বশী যাদব

ক্যাশলেস অর্থনীতির নবীন রূপকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইলিওনর রুজভেল্ট বলেছিলেন, 'মেয়েরা হলো টি-ব্যাগের মতো। গরম জলে না ফেললে কতটা কড়া ঠিক বোঝা যায় না।' কথাটা উর্বশী যাদবের জীবনে অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। জীবন তাকে যত গরমজলে ফেলেছে ততই তিনি কড়া হয়েছেন। নয়তো তিনি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের স্বাভাবিক লজ্জা-সঙ্কোচ অতিক্রম করে ঠেলাগাড়িতে ছোলে কুলচা সাজিয়ে রাস্তায় বিক্রি করতে পারতেন না। আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে সাড়া দিয়ে এবং নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে গুরুগ্রামের অন্যান্য হকারদের পেটিএম মারফত লেনদেনের হালহদিশও দিতে পারতেন না।

উর্বশী যাদব। ছোলে কুলচের ডাব্বা (ডানদিকে)।

আশ্চর্য জীবন উর্বশীর। স্নাতকস্তরের পড়াশোনা শেষ করার পর দিল্লির একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোটেলে আধিকারিকের চাকরি পেয়েছিলেন। ২০০৪ সালে অমিত যাদবের সঙ্গে বিয়ে হলো। অমিতের পরিচয় তিনি অবসরপ্রাপ্ত উইং কম্যান্ডার এন. কে যাদবের একমাত্র পুত্র। সে সময় অমিত একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে ফেসিলিটি ম্যানেজার ছিলেন। দুর্ভাগ্যের শুরু ২০১০ থেকে। ওই বছর অমিত ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ডান পায়ে সামান্য চোট পান। প্রথমে কেউই পাত্তা দেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল অমিতের ডান পায়ে কোনো একটা স্নায়ুতে রক্ত-সঞ্চালন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। চিকিৎসকেরা অমিতকে নিতম্ব পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তখনই তেমন কিছু করতে হলো না। কারণ অমিত সেরে উঠছিলেন। অফিসেও জয়েন করলেন এক সময়। সব কিছু আবার আগের মতো হয়ে যাচ্ছে দেখে উর্বশী নতুন করে তার কেরিয়ার শুরু করার কথা ভাবছিলেন। সেইমতো ২০১৩ সালে মডার্ন মন্টেশ্বরি টিচার্স ট্রেনিং (এম এস আই) নিয়ে চাকরি পেলেন কিডজি প্রিস্কুলে। যখন মনে হচ্ছে এবার যা হবে ভালোই হবে, ঠিক তখনই দুর্ভাগ্য আবার আঘাত হানল। ২০১৬ সালে অমিত ওই ডান পায়ে নতুন করে আঘাত পেলেন। এখনও যখন সেই ঝোড়ো সময়ের কথা মনে পড়লে উর্বশী কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে যান। তারপর বলেন, 'ওই একটা আঘাত আমাদের সকলের জীবন বদলে দিয়েছিল। শুধু ভাবতাম, অমিতের যদি হিপ রিপ্লেসমেন্ট অপারেশন হয় তাহলে কী হবে!

এই ভাবনাই উর্বশীকে আরও অর্থকরী কিছু করার কথা ভাবতে বাধ্য করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন অমিতের পক্ষে আর চাকরি করা সম্ভব হবে না। বাচ্চাদের স্কুলে চাকরি করে তিনিও এত বড়ো অপারেশনের ঝক্কি সামলাতে পারবেন না। সুতরাং তাঁকে ব্যবসা করতে হবে। কিন্তু কীসের ব্যবসা! বুটিক বা পার্লারের ব্যবসায় অনেক টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। কাস্টমার পাওয়াও অত সহজ নয়। এই সময় একদিন এক হকারকে ঠেলাগাড়িতে ছোলে কুলচে বিক্রি করতে দেখেন।

উর্বশী তার কাঙ্ক্ষিত আইডিয়া পেলেন। ওই হকারই হয়ে উঠলেন তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা। উর্বশীর কাছ থেকে সব শুনে অমিত কার্যত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তার ভয় উর্বশী এত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু উর্বশী নাছোড়। সংসার বাঁচাতে তাকে পারতেই হবে। ওই হকারের সহায়তায় গাড়ি কেনা হলো। অন্যান্য কাঁচামাল এবং বাসনপত্রও এল। ২০১৬ সালের ১৫ জুন উর্বশী যাদব গাড়িতে ছোলে কুলচের ডাব্বা সাজিয়ে গুরুগ্রামের ১৪নং সেক্টরে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু হরিয়ানার মতো রাজ্যে মেয়েদের রাস্তায় নেমে ব্যবসা করা তত সহজ নয়। অজস্র প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। এখন আর সেসব কথা উর্বশী মনে রাখতে চান না। মনে রাখতে চান তাঁদের কথা যারা তাকে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে সোনালির কথা। সোনালি একজন ব্লগার। উর্বশীর কথা জানার পর তিনি তার কথা ফেসবুক পেজে লেখেন। তারপর থেকেই উর্বশীর ব্যবসা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

সময়ের সঙ্গে চলতে আগ্রহী উর্বশী সম্প্রতি পেটিএম মারফত লেনদেন চালু করেছেন। শুধু তাই নয়, অন্যান্য হকাররাও যাতে পেটিএম ব্যবহার করেন তার জন্যেও উর্বশীর চেষ্টার অন্ত নেই। তিনি বিশ্বাস করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত লেসক্যাশ অর্থনীতিই ভারতের ভবিষ্যৎ। তাই কেউ যখন নগদহীন লেনদেন করতে গিয়ে আটকে যান, ছুটে আসেন সাহায্যের আশায়, কোথায় ভুল উর্বশী সস্নেহে বুঝিয়ে দেন। কখন যেন তিনি হয়ে ওঠেন অনাগত সেই নগদহীন অর্থনীতির একজন রূপকার। হেসে বলেন, 'ওদের মধ্যে আমিই একমাত্র শিক্ষিত। আমি যা জানি সেটা ওদের জানানো আমার কর্তব্য।'

সত্যিই আশ্চর্য মানুষ। এমন একজন মানুষ যিনি সম্ভবত বিষের সমুদ্র থেকেও অমৃতমন্থন করতে পারেন। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

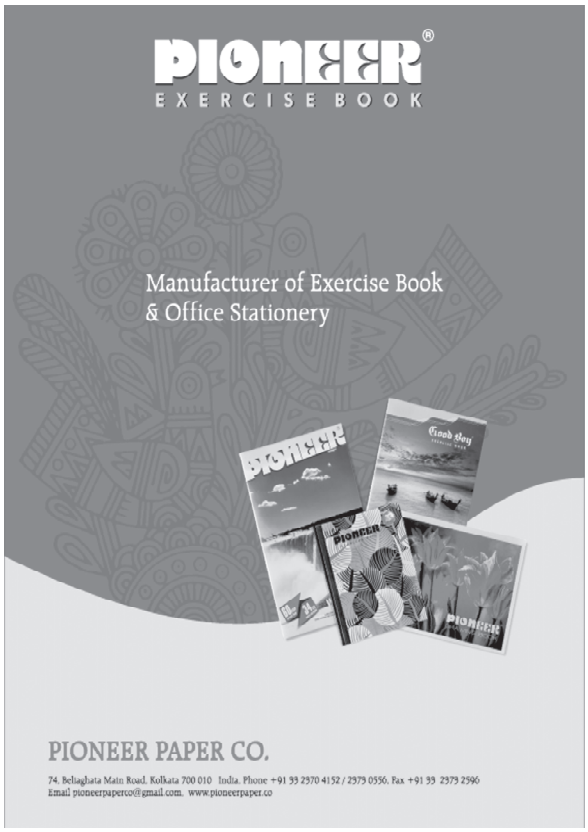

"শাস্ত্র, গুরু এবং মাতৃভূমি— যেন তিনটি সুর মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান সঙ্গীত। প্রেমিকের হৃদয় নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর তাঁর আরাধ্য দেবতা ছিলেন জননী জন্মভূমি। একটি ঘণ্টাকে যদি চারদিকের ভার সমান করে নিপুণভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তাহলে তা যেমন কোনো শব্দ দ্বারা পুষ্ট হওয়ামাত্র ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, ভারতের চারপ্রান্ত মধ্যে উত্থিত যে কোনো কাতরধ্বনি (সেইভাবেই) তাঁর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

প্রোটিন ও ঔষধীয়গুণে সমৃদ্ধ মাশরুম

ড. বিভূতি ভূষণ সরকার

মাশরুম বা খাদ্যোপযোগী ছত্রাক নিরামিষ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যশক্তি ও ঔষধীয়গুণে ভরপুর এক প্রকার সবজি। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বনজঙ্গল থেকে মাশরুম সংগ্রহ করে খেতো। বিভিন্ন প্রকার মাশরুম খাওয়ার তথ্য পুরানো গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে উল্লেখ আছে। গ্রীক ও রোমান গ্রন্থে মাশরুমকে 'দেবতার নৈবেদ্য' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকেই মাশরুম মানুষের খাদ্য হিসাবে সুপরিচিত ছিল এবং প্রাচীনকালে মিশরের রাজা মাশরুমের খাদ্যগুণে আকৃষ্ট হয়ে খাদ্যোপযোগী ছত্রাকের নাম 'মাশরুম' অর্থাৎ 'দেবতার খাদ্য' রাখেন। প্রাচীন রূপকথার বর্ণনা অনুসারে গ্রীক বীর পারসিয়ান তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মাশরুমের রস পান করে পরিতৃপ্ত হন। যে স্থান থেকে মাশরুম আহরণ করেন, সেই স্থানের নাম দেন মাইসেনি। প্রাচীন গ্রীসের এই স্থানেই প্রখ্যাত মাইসেনিয়ান সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক ওয়াসনের মতে ঋক্‌বেদে উল্লেখিত সোম হলো অ্যামানিটা মুস্কারিয়া নামক একটি মাশরুম। মেক্সিকোতে রেড ইন্ডিয়ানরা বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাশরুম পবিত্র খাদ্য রূপে ব্যবহার করে আসছে। মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনে প্রস্তরে উৎকীর্ণ মাশরুম আকৃতির অনেক চিত্র পাওয়া যায়। কাজেই মায়া সভ্যতার সময় মাশরুম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হোত বলে মনে করা হয়। ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে ধার জেলার বাঘ নামক বৌদ্ধ গুহার দেওয়ালে মাশরুমের চিত্র উৎকীর্ণ আছে। বাঘের এই চিত্রগুলি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে অঙ্কিত হয়েছিল।

মাশরুমের খাদ্যগুণ বিশ্লেষণে জানা যায়, এতে গুণগত মানের প্রোটিনের পরিমাণ অন্যান্য শাকসবজির তুলনায় বেশি, অন্য নিরামিষ প্রোটিনের চেয়ে অনেক উন্নতমানের এবং সুপাচ্য। মাশরুমে প্রোটিনের পরিমাণ বাঁধাকপি, টম্যাটো, ঢ্যাঁড়শ, বেগুন, পালং, কুমড়ো, আলু ইত্যাদি অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বেশি এবং গাজর অপেক্ষা প্রায় চারগুণ এবং কমলালেবু অপেক্ষা প্রায় ছয়গুণ বেশি। মাশরুমে পর্যাপ্ত পরিমাণ এনজাইম বা উৎসেচক বিশেষত ট্রিপসিন এবং অগ্নাশয় থেকে নির্গত জারক রসসমূহ আছে বলে মাশরুম খাদ্য পরিপাক এবং হজমে সাহায্য করে। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ইউলিয়ামস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আবিষ্কার করেছিলেন যে মাশরুমে যথেষ্ট পরিমাণ ফোলিক অ্যাসিড আছে যা মানুষকে রক্তশূন্যতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এবং তখন থেকেই সারা বিশ্বে মাশরুমের চাহিদা দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। মাশরুমে ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিদ্যমান থাকায় ক্যান্সার রোগীর পথ্য হিসেবে মাশরুম ব্যবহার করা হয়। ফ্রান্সবাসীরা পর্যাপ্ত পরিমাণ মাশরুম খান বলে ফ্রান্সে গত এক শতাব্দী ধরে ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাব কম বলে দাবি করা হয়। কারণ হিসেবে অবশ্য দেখানো হয় যে, মাশরুমে পর্যাপ্ত পরিমাণে খনিজ লবণ থাকায় যারা দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত মাশরুম খান, তাদের ক্যান্সার রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। অন্যদিকে, মাশরুমে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন বি, সি এবং ডি থাকায় হৃদরোগ, বেরিবেরি এবং স্কার্ভি রোগীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আবার মাশরুমে স্নেহ ও শর্করা জাতীয় পদার্থের পরিমাণ খুব কম থাকায় বহুমূত্র রোগীদের এবং যারা দেহের স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন কমাতে চান তাঁদের পক্ষেও অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। তাছাড়া মাশরুমে কিছুটা নিয়াসিন ও প্যান্টোথ্যালিক অ্যাসিড থাকায় যে সকল রোগী হাতে পায়ে জ্বালাপোড়া অনুভব করে, তাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাতেও স্থান করে নিয়েছে। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, আয়রন ও কপার জাতীয় মিনারেল যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় বাচ্চাদের স্বাভাবিক হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধির জন্য এবং ভিটামিন 'এ' থাকায় বৃদ্ধদের চোখের ও চামড়ার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মাশরুম সমাদৃত। মাশরুম নিয়মিত খেলে শরীরে ইন্টারফেরন নামক বস্তু তৈরি হয় যা ভাইরাস জনিত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। মাশরুমে সোডিয়ামের পরিমাণ কম থাকায় হার্ট ও কিডনি রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিসস্ট্রেশনের তথ্য অনুসারে অ্যারিকুলেরিয়া মাশরুম বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস রোগ বিশেষ করে এইডস, পোলিও, হারপিস ইত্যাদি প্রতিরোধ করতে সক্ষম। মোট কথা মাশরুম হলো সুস্বাদু, পুষ্টিকর খাদ্যশক্তি ও ঔষধীয়গুণে ভরপুর আবালবৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, নিরামিশী সকলেরই অতিপ্রিয় খাদ্য। ■

উত্তরপূর্বাঞ্চলে সন্ত সম্মেলন

গত ১১ জানুয়ারি উত্তরপূর্বাঞ্চলের গুয়াহাটি শহরে শ্রীমদ্‌ভাগবত কথার প্রথম অধিবেশনে উত্তরপূর্বাঞ্চলের সমস্ত ধর্মীয় মত-পথ- সম্প্রদায়-জাতি-উপজাতির প্রমুখদের এবং মঠ, মন্দির, সত্রের মঠাধীশ ও মোহন্তদের নিয়ে এক বিশাল সন্ত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সন্ত সম্মেলনের শুভারম্ভ হয় সম্মেলনের সংযোজক তথা সভাপতি কমলাবাড়ি সত্রের সত্রাধিকারী প্রভু জনার্দনদেব গোস্বামী, বনবন্ধু পরিষদের রাষ্ট্রীয় উপাধ্যক্ষ অরুণকুমার বাজাজ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর অসম প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক বশিষ্ঠ বুজর

বরুয়া'র প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির কার্যকর্তারা সম্মেলনে উপস্থিত সমস্ত জনজাতির ধর্মগুরু, সাধু-সন্ন্যাসী এবং বিভিন্ন সত্রাধিকারীদের অসমের ফুলাম গামছা ও শাল পরিয়ে দিয়ে অভিনন্দন জানান।

সম্মেলনে বনবন্ধু পরিষদের রাষ্ট্রীয় উপাধ্যক্ষ অরুণকুমার বাজাজ সন্তসমাগমের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, সমস্ত জনজাতির ধর্মগুরু, নামঘর, মঠের সন্ত এবং বিভিন্ন সত্রের সত্রাধিকারীরা একসঙ্গে বসে চিন্তন-মন্থন করে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সংকল্পবদ্ধ হওয়া। তিনি জানান, শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি উত্তরপূর্বাঞ্চলে চার হাজার একল বিদ্যালয় এবং চার হাজারের বেশি গ্রামে সংস্কার কেন্দ্র চালাচ্ছে। বনবন্ধু পরিষদের এক সময়ের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ কলকাতার সজ্জন ভাজনকা জানান, ১৯৯৮ সালে তিনসুকিয়াকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ, ভুটান, মিয়ানমার ও চীন সীমান্তের গ্রামে একল বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় এবং ২০২১ সালে ওই এলাকায় সাত হাজার একল বিদ্যালয়ের লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

সমাবেশ সমাচার

হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সংবর্ধন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর অসম প্রান্ত প্রচারক বশিষ্ঠ বুজর বরুয়া, পূজ্য ভূপেন্দ্র পন্ড্যা-সহ বিভিন্ন জনজাতির ধর্মগুরু এবং বিভিন্ন সত্রের সত্রাধিকারীরা।

সন্ত সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। (১) সনাতন পরম্পরার প্রচার ও প্রসারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থানীয় ধর্মীয়স্থলকে সংস্কারকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত করা। (২) পরাবর্তন পদ্ধতির সরলীকরণ এবং সর্বস্তরে ধর্মান্তরণের বিরোধিতা করা। (৩) সেবাভাবী আধ্যাত্মিক সংস্থা ও লোকেদের দ্বারা সর্বসাধারণের মধ্যে সেবার মনোভাব জাগ্রত করা এবং ধর্মানুষ্ঠানগুলি শিক্ষা ও সংস্কারের শক্তিকেন্দ্র রূপে স্থাপিত করার ব্যবস্থা করা। (৪) উপাসনা পদ্ধতি আলাদা হলেও হিন্দু পরম্পরার প্রতি সবাই একজোট হয়ে দেশ ও সমাজ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসা। (৫) উপস্থিত সমস্ত মহানুভবদের দ্বারা প্রতি বছর সন্ত সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সংস্কার ভারতী সোনারপুর গ্রামীণ শাখার উদ্যোগে ভারতমাতা পূজা

গত ২৬ জানুয়ারি ভারতমাতা পূজা অনুষ্ঠিত হয় সোনারপুর- নতুনপল্লীস্থ 'দক্ষিণ পূর্ব উন্নয়ন সমিতি' প্রাঙ্গণে সংস্কার ভারতী সোনারপুর গ্রামীণ শাখার উদ্যোগে। ভারতমাতা অঙ্কন প্রতিযোগিতা, 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী' ভাবসঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে, সায়ন সুভাষিত ও অমৃত বচন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়। সংস্কার ভারতী সোনারপুর গ্রামীণ শাখার সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডল সভাপতির আসন গ্রহণ

করেন। প্রধান অতিথি সংস্কার ভারতীর বিশিষ্ট নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা বিকাশ ভট্টাচার্যকে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করেন জয়ন্তী মণ্ডল। কবি ও বিজ্ঞানভিত্তিক

ছড়াকার, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী কৃষ্ণলাল মাইতি এবং কবি-সাহিত্যিক-সমাজসেবী শশাঙ্কশেখর মৃধা-কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি বিকাশ ভট্টাচার্য সংসার ভারতীর গঠন তন্ত্র, কার্যকারিতা, ভারতমাতা পুজার তাৎপর্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধির এক চিত্র অঙ্কন করেন। কৃষ্ণলাল মাইতি ও শশাঙ্কশেখর মৃধা উভয়ে সমাজ সংস্কার বিষয়ের উপর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। ভারতমাতা অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য়— স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। পরে কবিতা পাঠ ও গীতার অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে ও সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের পরে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শেখর মণ্ডল সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন।

মঙ্গলনিধি

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সুন্দরবন জেলার কুলতলী ৪ নং খণ্ডকার্যবাহ উৎপল নস্করের পুত্র শুভমের প্রথমবর্ষ জন্মদিন উপলক্ষে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন বিভাগ প্রচারক অর্জুন মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সুন্দরবন জেলার ক্যানিং ঘোষপাড়ার স্বয়ংসেবক বিশ্বজিৎ মণ্ডলের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা প্রচারক পরিমল দলুই ও জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ দীপক নস্করের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

মালদা জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গাজোল প্রখণ্ডের বিবেকানন্দ পল্লীর একনিষ্ঠ সদস্য রান্টু সাহা গত ৪ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পরিবার সম্মেলন

গত ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয়ে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলার— কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া— পরিবার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ দেশব্যাপী যে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা অভিযান শুরু করেছে তার পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনাও হলো এই পরিবার সম্মেলনের প্রথম দিন। স্বাক্ষরপত্রে প্রথম স্বাক্ষর করে আনুষ্ঠানিক সূচনা এবং উপস্থিত স্বদেশী সমর্থকদের পথনির্দেশ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ- সরকার্যবাহ বি ভাগাইয়াজী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জি, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংঘর্ষবাহিনী প্রমুখ অন্নদাশঙ্কর পাণিগ্রাহী প্রমুখ। ওই দিন বিকেলে গঙ্গাসাগরের কেন্দ্রস্থলে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা অভিযানের একটি পথসভায় অন্নদাশঙ্কর পাণিগ্রাহী, বন্দেশঙ্কর সিং প্রমুখ বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করায় এলাকায় প্রচুর স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। শতাধিক ব্যক্তি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সংগঠিত করেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সংগঠক সুব্রত মণ্ডল।

হাওড়ার তাজপুরে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট অব্ কালচার ও কলকাতা রোটারি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে হাওড়া জেলার তাজপুরে শ্যামাপ্রসাদ জনস্বাস্থ্য নিকেতনে একদিনের একটি স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে চক্ষু, দন্ত, অস্থিবিশেষজ্ঞ, শিশু বিশেষজ্ঞ,

চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রসূতিরোগ বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ১৮২ জন শিশু, মাতা ও সাধারণ রোগীর পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, শিবিরে ৩২ জন শিশু ও অভিভাবককে চশমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতা রোটারি ক্লাবের উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ ভবিষ্যতে অনুরূপ স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন রোটারিয়ান অমিত ঘোষ ও ডাঃ অশোক কুমার বাসু।

নৈহাটিতে আয়ুর্বেদিক চিৎকৎসা শিবির

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির গোয়ালপাড়া ঘাটে আরোগ্য ভারতী এবং ন্যাশনাল আয়ুর্বেদিক স্টুডেন্টস্ অ্যান্ড ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিবির

অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে এলাকার ৩০০ জন পুরুষ, মহিলা ও শিশু চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করে। শিবির পরিচালনা করেন আরোগ্য ভারতীর ব্যারাকপুর জেলা সভাপতি অসিতবরণ আইচ ও ন্যাশনাল আয়ুর্বেদিক স্টুডেন্টস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সুশোভন পাল। চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈদ্য রত্নাকর বাচস্পতি, কৃষ্ণেন্দু সাহা ও ডাঃ সুদীপ্ত ঘোষ।

সংস্কার ভারতীর নিবেদিতা প্রণাম

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার রামমোহন মঞ্চে আয়োজিত হয় ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ক একটি আলোচনা সভা। সভায় বক্তা ছিলেন উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক স্বামী চৈতন্যানন্দ, সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। সভায় প্রাক্কথন পর্বটি সম্পন্ন করেন সংস্কার ভারতীর মাতৃশক্তি প্রমুখ অধ্যাপিকা দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক সভাপতি তপন গাঙ্গুলী।

সভায় উভয় বক্তাই নিবেদিতার ভারতপ্রেমী-মাতৃসুলভ সত্তার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি গ্রামীণ ভারতকে ভালবেসেছিলেন। ভারতীয় চিত্রকলা, শিল্পকলাকে বিদেশের দরবারে উন্নীত করার ক্ষেত্রে নিবেদিতার অনুপ্রেরণা ও অবদান অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষের একটি জাতীয় পতাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি বজ্রচিহ্নিত পতাকাটির কল্পনা করেন। গুরু স্বামী বিবেকানন্দর প্রদর্শিত আদর্শে তিনি নিজেকে মনে প্রাণে, কার্যে ভারতীয় করে গড়ে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত পালাপার্বণকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। জ্ঞান ঐশ্বর্যের দেবী রূপে তিনি সরস্বতীর ব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় নারীজীবনের বিভিন্ন অবস্থা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন— চঞ্চলা কিশোরী, লজ্জাশীলা বধূ, সংসারের কর্ত্রী তথা মাতা এবং বৈধব্য অর্থাৎ তপস্বিনীর জীবন।

এই চারটি পর্যায়ে ভারতীয় নারী চরিত্র আবর্তিত হয়। রামায়ণ মহাভারতের নারী চরিত্রের প্রতি ছিল তার প্রগাঢ় সম্মান। বিনা প্রত্যাশায় ভগিনী নিবেদিতা ভারতকে জগৎসভায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। মাতৃঋণ সম নিবেদিতার কাছে ভারতবাসী ভগিনী-ঋণে ঋণী। ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগ ও অবদান বিস্মৃত হওয়া ভারতবাসীর অপরাধ।

সভাপতি তপন গাঙ্গুলী বলেন, নিবেদিতার জন্মসার্ধশতবর্ষে সংস্কার ভারতীর লক্ষ্য বিভিন্ন জেলায় আলোচনা সভা ও চর্চার মাধ্যমে নিবেদিতা স্মরণ। আলোচনা সভার দ্বিতীয়ার্ধে ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য রূপে পরিবেশিত হয় একটি সংক্ষিপ্ত সঙ্গীতানুষ্ঠান। পরিবেশন করেন শালিনী ঘোষ, সোহিনী ঘোষ এবং রুমা মুখোপাধ্যায়।

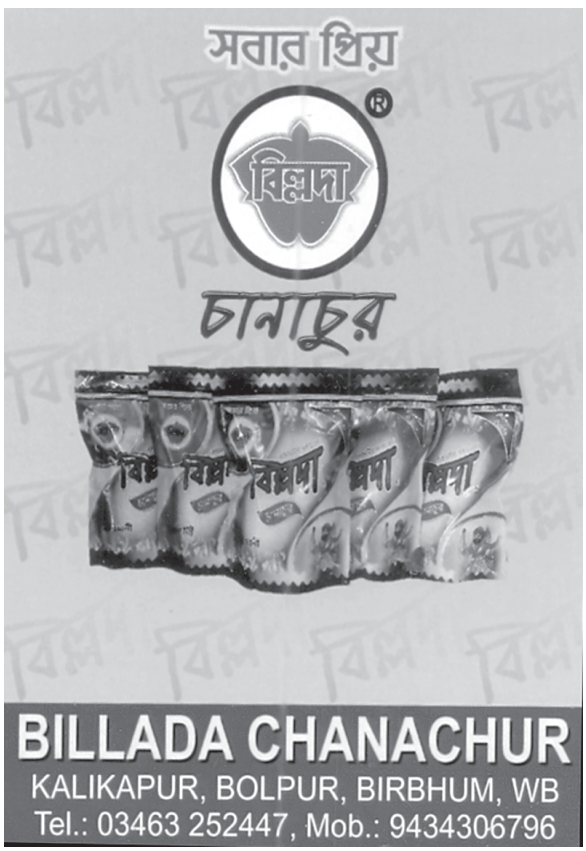

যতদিন বাঁচব দেশের কাজ করে যাব : জয়ন্ত পুশিলাল

'আমরা অনেক স্বপ্ন দেখি। এও স্বপ্ন দেখি একদিন তোর হাত ধরেই আমাদের বাংলা বার্না, বেলাক কাপ-সহ সমস্ত ট্রফির গায়ে নিজের নাম খোদাই করবে'। ১৯৯২-য়ে এক বসন্তপ্রাহরিক বিকেলে ওয়াই এম সি এ-তে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বলেছিলেন বাংলার টেবল টেনিসের অন্যতম প্রাণপুরুষ তথা রাজ্যের অগ্রণী ক্রীড়া সংগঠক গোপীনাথ ঘোষ টেবল টেনিসের 'দ্রোণাচার্য' জয়ন্ত পুশিলালকে। গুরুর মান ও নাম রেখেছিলেন শিষ্য। ১৯৯৪-য়ে বাংলা সর্বভারতীয় আসরে সব বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনালি স্বপ্নের জাল বুনে দেয়। কোচ ছিলেন জয়ন্ত। তারপর তাঁর হাত ধরে আরো বেশ কয়েকবার জাতীয় সেরার তকমা জুটেছে বাংলার ছেলেমেয়েদের। জাতীয় পর্যায়ে অজস্র চ্যাম্পিয়ন তৈরির কারিগর জয়ন্ত। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন স্বস্তিকার প্রতিনিধি জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্রিকেট ছেড়ে টেবল টেনিসে আসার প্রেক্ষাপট কী?

১৯৭৫-য়ে কলকাতায় বিশ্ব টেবল টেনিস মিট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই আসরে ড্রাগুটিন সুরবেক, শি এন টিং, স্বেন যোহানসন, ওয়ালডনারদের শিল্পমণ্ডিত টেবল টেনিস দেখে রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়েছিল মনে। তখনই ঠিক করে নিয়েছিলাম এই খেলাটাই হবে আমার ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার জীয়নকাঠি। স্কুলে পড়ার সময়ে সব খেলাই খেলতাম। স্কুল টিমে ফুটবল, ক্রিকেটে একপ্রকার হিরোই ছিলাম। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ঠিক করলাম টেবল টেনিস হবে আমার জীবন-জীবিকার মেলবন্ধন। এর প্রেক্ষিতে রয়েছে ওই বিশ্ব প্রতিযোগিতার ধ্রুপদী সব খেলা।

প্রথামাফিক প্রশিক্ষণের দিকটা যদি বলেন—

আমি সে অর্থে ডিগ্রিধারী কোচ নই। আমার ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড দু'জন। প্রথমে যার কথা বলা হয়েছে সেই গোপীনাথ ঘোষ আর একদা রাজ্য চ্যাম্পিয়ন প্রয়াত শ্যামসুন্দর ঘোষ। এই দু'জন আমাকে বিদেশি পত্রপত্রিকা নিয়মিত জোগান দিতেন। হেরল্ড মেরর, বিয়ন্ডবর্ন, বেসিক টেবল টেনিস অব ভিক্টর রানা প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য প্রামাণ্য গ্রন্থ পড়ে খেলাটির বিবর্তন ও প্রয়োগরীতি সম্পর্কে রীতিমত পরিশীলিত বোধের অধিকারী হয়ে উঠলাম। আর তারপরই হঠাৎ সুযোগ এসে গেল ১৯৮৬-তে মিরাটের ইনট্যাবে বাংলার সহযোগী কোচ হয়ে কাজ করার। এভাবেই আমার কোচিং জীবনের রাস্তা খুলে গেল।

জাতীয় স্তরে আপনার সাফল্যের খতিয়ান তো...

হ্যাঁ, মিরাটের পর রাঁচিতে পূর্বাঞ্চল সিটে এককভাবে বাংলার দায়িত্ব পেলাম। আমার হাতে গড়া অতুল বসাক চ্যাম্পিয়ন হলো অর্জুন দত্তকে হারিয়ে। এরপর ইনট্যাবের ফাইনালে প্রতিষ্ঠিত তারকা নূপুর সাঁতরাকে মেরে বেরিয়ে গেল অরূপ। এই ঘটনাটা আমাদের দু'জনেরই কাছে টার্নিং পয়েন্ট। এর আগে বেশ কয়েকবার খেলা থেকে বেরিয়ে আসব ভেবেছিলাম। কেউ কেউ আমার টেবল টেনিস ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকায় সমালোচনা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দিচ্ছিল। ওই এক গোপীনাথ ঘোষ সবসময় আমার পাশে ছিলেন আর কানে মন্ত্র দিয়ে গেছেন তুই পারবি, তোর হাত ধরেই বাংলার টেবল টেনিস সর্বভারতীয় স্তরে গরিমার কেন্দ্রে অবস্থান করবে। তার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। এরপর আরো তিনবার বাংলা দলগত ও ব্যক্তিগত প্রায় সব বিভাগে জাতীয় সেরা হয়েছে।

এত কিছু করেও দেশের কোচ হতে পারেননি— কী বলবেন?

এ ব্যাপারটা আমার হাতে নেই। দেশের সর্বময় কর্তা (তৎকালীন) মূলচাঁদ চৌহানের সঙ্গে গোপীদার সম্পর্কের অবনতিই মনে হয় একমাত্র কারণ। আমার হাতেগড়া অরূপ, মৌমা দাস, কিশলয় বসাক, দেবস্মিতা দাসরা দেশের জার্সি পরে এশিয়াড, কমনওয়েলথ, বিশ্ব টিটিতে প্রতিনিধিত্ব করেছে। ওটাই আমার সান্ত্বনা। ওদের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাই জাতীয় দলের ডি-ফ্যাকটো কোচ হিসেবে। তবে আমার দেশ আমাকে না চিনলে কী হবে, আমেরিকা কিন্তু ঠিক চিনেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা যদি ভাগ করে নেন স্বস্তিকার পাঠকদের সঙ্গে—

আমি যথেষ্ট হোমসিক। ইস্কনের লাইফ মেম্বার। দেশের মানুষ ক্রীড়াসংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থাই আমার মনপ্রাণ জুড়ে আছে। বিদেশ বিভূঁয়ে যতই সুযোগ সুবিধে থাক না কেন, অর্থের প্রাচুর্য হাতছানি দিক না কেন নিজের দেশের জন্য চ্যাম্পিয়ন তৈরি করাই আমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। তাই চার বছর একটানা থাকতে পারিনি। সময়-সুযোগ মতো গেছি ও কোচিং করিয়ে এসেছি। আমার ছাত্রছাত্রী বিশ্বমঞ্চে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেছে। ভারত ও আমেরিকার হয়ে খেলা আমার ছাত্রছাত্রীরা জয়ন্ত পুশিলালের জীবনের দিকচক্রবাল বদলে দিয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আছে?

রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত টেবল টেনিস অ্যাকাডেমি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। যথেষ্ট ভালমানের অ্যাকাডেমি হতে চলেছে। আমি আর জনাতিনেক কোচ সল্টলেকের ওই অ্যাকাডেমিতে সামনের শীতকাল থেকেই কাজ শুরু করে দেব। উচ্চশিক্ষা নিয়েও চাকরি করিনি। খেলা ও খোলায়াড়রাই আমার জীবনসত্ত্বা। যতদিন বাঁচব দেশের কাজ করে যাব।

শব্দরূপ-৮২৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

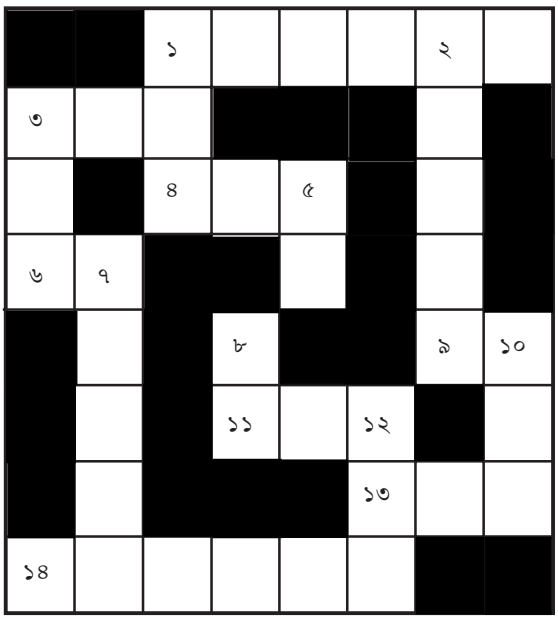

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. সারদা মায়ের জন্মস্থান, **৩.** গুজরাট নৃত্য-গীত, **৪.** স্বনাম-প্রসিদ্ধ দরবেশ, **৬.** 'অঞ্জলি—মোর সঙ্গীতে', **৯.** কদম্বপুষ্প বা বৃক্ষ, **১১.** বেগুন, **১৩.** মৃতদেহাশ্রয়ী প্রেত; শিবের অনুচর; তালভঙ্গ (সঙ্গীতে), **১৪.** রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান।

উপর-নীচ : ১. ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত সত্যকাম-জননী, **২.** সরস্বতী, **৩.** প্রেমসঙ্গীত (আরবিতে), **৫.** কুমীর, **৭.** যাতে সত্য বলিবার জন্য শপথের পাঠ লেখা থাকে, **৮.** বোবা, মূক, **১২.** যক্ষরাজ, মহাধনী।

সমাধান
শব্দরূপ-৮২২

সঠিক উত্তরদাতা

সুশীল কয়াল
তাঁতিবেড়িয়া, হাওড়া
সঞ্জয় পাল
সাহাপুর, মালদা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৮২৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৭ মার্চ ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

▯ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

▯ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

▯ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

▯ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

▯ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

▯ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

▯ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

▯ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

▯ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

▯ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ২৪

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

কাশ্মীরে নন্দকিশোর মন্দিরে শিবরাত্রি পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা এলাকা ছেড়ে চলে যাবার পর বান্দিপোরার নন্দকিশোর মন্দিরে মানুষের পা পড়েনি। পুজো দূরে থাক মন্দির পরিষ্কার করার লোকও মিলত না। সেই জরাজীর্ণ নন্দকিশোর মন্দিরে এ বছর সাড়ম্বরে শিবরাত্রি পালিত হয়েছে। স্থানীয় মুসলমান তরুণেরা আগাছা সাফ করে উৎসবের সূচনা করেন। শিবকে দুধস্নান করানো

হয়, নিবেদন করা হয় ফলমূল, মিষ্টি দিয়ে সাজানো নৈবেদ্য। কিছু পরে ভিটেমাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা গুটিকয়েক পণ্ডিত পরিবার পুজোয় যোগ দেন। মন্দিরের বাইরে তখন প্ল্যাকার্ড হাতে বেশ কিছু মুসলমান। কারও প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'এবার থেকে আমরা সবাই একসঙ্গে শিবরাত্রি পালন করব।' কেউ লিখেছেন, 'নিজেদের জায়গায় ফিরে আসুন কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা।' ধর্মীয় বিভেদ ভোলার চেষ্টা তো বটেই, সেই সঙ্গে ইসলামের আঁধার পেরিয়ে আলোয় ফেরার প্রয়াসও সম্ভবত শুরু করতে চাইছেন কাশ্মীরের মুসলমানদের একাংশ। এবারের শিবরাত্রি বার্তা দিয়ে গেল তারই।

ক্যাশলেস ভারত গড়তে রঘুনাথপুরে আই-টি প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্যাশলেস ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ছে মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মতো শব্দবন্ধ। কিন্তু একটি সাবেকি ব্যবস্থাকে অত্যাধুনিক করে তুলতে হলে সাধারণ মানুষের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তি সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা দূর করতে এগিয়ে এসেছে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরের আচার্য শ্রীজ্ঞানসাগর সবাক উত্থাপন কেন্দ্র নামে একটি সংস্থা। স্কুল পড়ুয়া কিশোর থেকে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ অনেকেই সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে ইন্টারনেটকে দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তার পাঠ নিচ্ছেন। রঘুনাথপুরে তো বটেই, আশেপাশের একাধিক গ্রামের মানুষও প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহী। সংস্থার উপদেষ্টা ড. নীলম জৈন বলেন, 'এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্যাশলেশ ইন্ডিয়ার স্বপ্ন সফল করা যাবে।'

ভারতে ইসলামিক স্টেটকে মাথা তুলতে দেব না : রাজনাথ সিংহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেছেন ভারতে ইসলামিক স্টেটকে কোনোভাবেই মাথা তুলতে দেওয়া হবে না। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, 'আই এস আই এস-এর গতিবিধির ওপর সরকার কড়া নজর রেখেছে। এই সংগঠনকে কোনোভাবেই দেশের নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জ করার অবকাশ দেওয়া হবে না।' সম্প্রতি গুজরাটে দুই সন্দেহভাজন আইএসজঙ্গিকে গ্রেপ্তার করার প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। তিনি জানান, ইসলামিক স্টেট যাতে ভারতের যুবকদের মগজধোলাই না করতে পারে তার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। সজাগ রয়েছেন সাধারণ মানুষও। রাজনাথ সিংহ বলেন, 'কিছুদিন আগে কয়েকজন ভুলপথে চলে যাওয়া যুবকের বাবা-মা আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কথা আমাকে জানিয়েছেন। যারা এসব করছে তাদের ওপর সরকারের নজর রয়েছে।' অন্যদিকে গুজরাটের রাজকোট এবং ভাবনগরে ধৃত দুই জঙ্গি পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে কবুল করেছে রাজকোটের ত্রিকোণবাগ ও গুণ্ডাওয়াড়ি অঞ্চলে তারা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিল।

সিমির পাণ্ডা-সহ দশজনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সিবিআই-এর বিশেষ আদালত স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়ার (সিমি) প্রধান সফদার নাগোরি-সহ দশজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। ভারতে যেসব সংস্থা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও গোপনে ইসলামি জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে এই রায় তাদের বিরুদ্ধে দেশের আইনব্যবস্থার একটি বড়োসড়ো পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক আমদানি এবং দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক বি কে পালোডা সিমির ১১ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। উল্লেখ্য, সিমি নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার সময় থেকেই সফদার নাগরি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পায়। আমেদাবাদ বিস্ফোরণ-সহ বেশ কয়েকটি নাশকতামূলক কাণ্ডে তার যোগ রয়েছে। কেরলের ওয়াগামনে একটি জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও চালাত বলে পুলিশসূত্রে জানা গেছে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
6 March - 2017 - Rs. 10.00,

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com

Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।